চতুর্থ সংখ্যা : আশ্বিন/১৪২৯ : সেপ্টেম্বর/২০২২

শাদ্বল

দ্বিমাসিক সাহিত্য ই-পত্রিকা

সম্পাদক: নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদ: সন্তোষ সিংহ

Email: ShadwalPatrika@yahoo.com
www.facebook.com/ShadwalPatrika

শাদ্বল ই-পত্রিকা

সম্পাদকঃ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদঃ সন্তোষ সিংহ

টাইপ সেটিং ও মূদ্রণঃ সম্পাদক, শাদ্বল

ঠিকানাঃ খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার সদর

জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ

শাদ্বল হোয়াটসঅ্যাপ নংঃ ৯৫৬৪৬৩২৪০৭

শাদ্বল ই-মেলঃ shadwalpatrika@yahoo.com

সূচিপত্রঃ

সম্পাদকীয়

গ্রন্থ আলোচনাঃ

নীলাঞ্জন কুমারের “বাজা খোল দশ কোশিতে” কাব্যগ্রন্থের আলোচনা/ সম্পাদক

কবিতাঃ

জন্ম মৃত্যু/ সন্তোষ সিংহ
অনুমতি দিন, মহারাজ/ রূপক সান্যাল
সৃষ্টি/ অমর চক্রবর্তী
ক্ষতিকারক/ নীলাঞ্জন কুমার
জানা নেই/ শৈবাল মজুমদার
নৌকা অভিযান / উদয়ন চক্রবর্তী
শঙ্খের ধ্বনি/ সঞ্জয় সোম
কেন যে?/ প্রতীক মিত্র
এখানে জীবন থমকে আছে/ ঈশিতা পাল
ব্যতীত/ দেবার্ঘ্য সেন
অপেক্ষা/ বন্দিশ ঘোষ
কালবৈশাখ/ সোনালি ভট্টাচার্য মুখোপাধ্যায়।
ভাওয়াইয়া / সুবীর সরকার
তুমি ফিরলে একা/ দেবাশীষ সরখেল
তবুও উলম্ব অধ্যায়/ ঋভু চট্টোপাধ্যায়
কে বলেছে ইতিহাস/ ঋভু চট্টোপাধ্যায়
আবার তোমাকে বেণীমাধব/ উর্মিলা চক্রবর্তী
ধূসরতা একটি প্রহর মাত্র/ হাবিবুর রহমান
স্পর্শ/ তীর্থঙ্কর সুমিত
উপত্যকা/ অরুণাভ বেরা
সুখস্মৃতি/ ভুবন সরকার
নিঝুম রাতের কান্না/ রথীন পার্থ মণ্ডল
লক্ষ্যবস্তুর দেওয়ালে/ অজিত কুমার জানা
মহুল পড়ে/ শ্রীকান্ত মাহাত
যন্ত্রণা/ নরেশ মল্লিক
ছায়া ও রং/ শিপ্রা পাল
এ সময়ের রবীন্দ্রনাথ/ চৈতালি ধরিত্রীকন্যা
প্রতিকৃতি/ মানস মজুমদার
বর্ষার চিঠি/ সুদীপ কুমার চক্রবর্তী
মধ্যবিত্ত/ অশেষ গাঙ্গুলী
আমার মন খারাপের দিনে/ সুবীর ঘোষ
মেঘ-শ্রাবণে/ বন্দনা পাত্র
শারদীয়া/ অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য
বিশ্বাস/ প্রদীপ মণ্ডল
লাল ইট/ সুব্রত কুণ্ডু
স্বপ্নের মানুষ/ কৌশিক গাঙ্গুলি
তুমি আসবে বলে/ আব্দুল জলিল
হলে ভালো হতো/ ত্রিদিবেশ দে
তাহলে হয়েই যাক/ গোবিন্দ মোদক
জীবন উদযাপন/ মল্লিকা দাশ রায়
যখন/ মৃত্যুঞ্জয় হালদার
মুক্তি/ মোহিত ব্যাপারী
অনন্যজয়ী/ সুতপা ব্যানার্জী (রায়)
সময়ের প্রমিথিউস/ নৃপেন্দ্র নারায়াণ ভট্টাচার্য্য

একটি অসমীয়া কবিতাঃ

ভাবিছোঁ/ নবযানী বৰুৱা শইকীয়া (ডিগবৈ)

ছড়াঃ

তবু ভুলব না/ পশুপতি দত্ত
জীবনের হিসাব/ বিকাশ চক্রবর্তী (বীরভূম)
ভূত/ অঞ্জলি দে নন্দী (মম)
দ্রব্যমূল্য/ অনন্য রাশেদ

ব্যক্তিগত নিবন্ধঃ

বর্ষাকাব্য/ শ্বেতা ভট্টাচার্য্য

ছোটোগল্পঃ

সন্তপ্ত/ মৃন্ময় ভৌমিক
একখণ্ড জলবতী মেঘ ও একটি অতৃপ্ত আত্মা/আসিফ আলতাফ

অণুগল্পঃ

বুকের দুধ/ কৃপাণ মৈত্র
সারপ্রাইজ/ গৌতমী ভট্টাচার্য
সাত/ উৎপলেন্দু পাল
জীব দেবেন যিনি আহার দেবেনই তিনি/ হরিদাস পাল

রম্য রচনাঃ বয়েস/ সুব্রত নন্দী (বর্ধমান)

সম্পাদকীয়

আনন্দের এই যে 'শাদ্বল' ই-পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা আজ মহালয়ার দিন প্রকাশিত হচ্ছে। এবারের সংখ্যার জন্য বহু সংখ্যক লেখা এসেছে। এতো সব লেখা পড়ে বাছাইয়ের কাজটি কঠিন হয়ে পড়ে। বহু সংখ্যক সাহিত্যসাধকের সুন্দরতম সাহিত্য-সৃষ্টিতে ভরে উঠেছে পত্রিকাটি। প্রতিবারের মতোই বিশিষ্ট লেখনীর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে নবীন ও তরুন প্রজন্মের লেখা। বিশিষ্টদের মাঝে একটু একটু করে নবীন লেখকদের লেখা সানন্দে প্রকাশ করে চলেছে এই পত্রিকা, যা ছোটো পত্রিকার মহৎ উদ্দেশ্য বলে পত্রিকা মনে করে। এবারের সংখ্যায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই আসাম, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি ইত্যাদি নানা স্থানের লেখকবৃন্দের লেখা রয়েছে। পত্রিকার গত সংখ্যাটি বারো হাজারের মতো সাহিত্য-শিল্পানুরাগী পাঠকের কাছে পৌঁছেছে। ছোটো পত্রিকা হিসেবে এটি একটি বড় সাফল্য। এই পত্রিকার সমস্ত সন্মানীয় লেখক-লেখিকা ও সন্মানীয় পাঠকবর্গের ঐকান্তিক উৎসাহেই পত্রিকাটি এভাবে এগিয়ে চলেছে। আশা রাখি আপনারা পত্রিকাটিকে আপনাদের পরিচয়ের মহলে আরো বেশি করে ছড়িয়ে দেবেন। পত্রিকার সাথে যুক্ত সম্মানীয় সাহিত্যসাধকবৃন্দ ও সাহিত্যপ্রেমী পাঠকবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শুভেচ্ছান্তে,
নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য,
সম্পাদক
শাদ্বল সাহিত্য ই-পত্রিকা
খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার সদর
জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

<u>'শাদ্বল' ই-পত্রিকায় লেখা দেওয়ার ঠিকানা ও নিয়মঃ</u> ১. যে কোনো ছোটো দৈর্ঘ্যের লেখা লেখককে প্রথমে এম. এস. ওয়ার্ডে লিখতে হবে। তারপর তা ডক্স ফাইল হিসাবে পাঠাতে হবে। পি. ডি. এফ হিসাবে নয়। বিকল্প হিসাবে নোট প্যাডে লিখে কপি পেস্ট করে পাঠাতে পারেন। এতে অবশ্য লাইন ফরম্যাট ভেঙ্গে যেতে পারে। জি-মেল বডি বা ওয়াটসয়্যাপ বডিতে লিখে পাঠানো যাবে। সব থেকে ভালো এম.এস.ওয়ার্ড ডক্স ফাইল। 2. পাঠাবেন এই জি-মেল বা ওয়াটসয়্যাপ নম্বরেঃ (ক) শাদ্বল হোয়াটসঅ্যাপ নংঃ ৯৫৬৪৬৩২৪০৭ (খ) শাদ্বল ই-মেলঃ shadwalpatrika@yahoo.com

গ্রন্থ আলোচনা

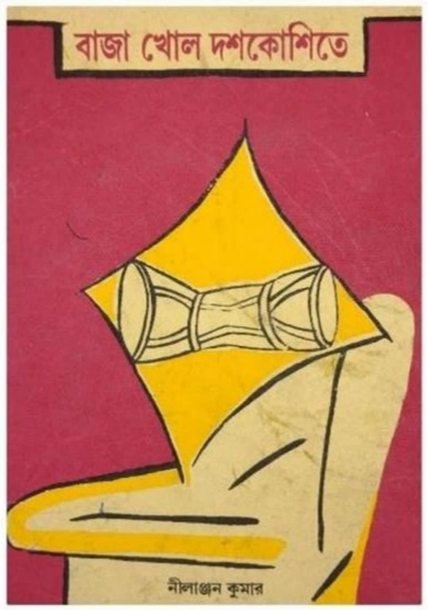

নীলাঞ্জন কুমারের কাব্যগ্রন্থ: ‘বাজা খোল দশ কোশিতে’- শিটশিটে অবয়ব, গভীর হৃদয়- একটি পর্যালোচনাঃ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

প্রতিটিই যেন এক একটি থিমের পুজো; অথচ কোনোটিই ধা-চকচকে কারুকাজ নয়; বরং থিমগুলোকে ব্যক্ত করতে যত কম উপকরণ ও নক্সার প্রয়োজন তাই দিয়েই পুজোর প্যান্ডেল; আর প্যান্ডেলের অভ্যন্তরীণ বেদীতে যার অধিষ্ঠান তিনি স্পিরিচুয়াল। ২০০৭ সালের গোড়ায় প্রকাশিত নীলাঞ্জন কুমারের ‘বাজা খোল দশ কোশিতে’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে উপরের কথাকয়টি নির্দ্বিধায় বলা যায়। বিষয়টি একটু এগিয়ে আলোচনার প্রয়োজন।

প্রথমেই থিমের আলোচনা করা যাক; নক্সা ও কৌশলের আলোচনা পরে; কেননা থিমকে প্রকাশ করতেই তো নক্সা ও কৌশলের প্রয়োজন।

নীলাঞ্জন কুমারের এই কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলোর মূল উৎসটিকে আমি একটু আগেই চিহ্নিত করেছি স্পিরিচুয়াল হিসাবে। এখন স্পিরিচুয়ালিটির কতোগুলো বৈশিষ্ট আছে, যেমন সততা, নৈতিকতা, কামের আবরণ উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান করা, আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া, ত্যাগকে জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে মানা, গভীর হতাশাতেও ভেতরের আশাবাদকে সম্বল করা এবং অর্জন করার চেষ্টা করা সেই পৃথিবী যেখানে ‘প্রত্যেক ঘ্রাণে সুগন্ধ, প্রতিটি স্বপ্নে সুদিন, সর্বোপরি নিজের ভেতর সর্বময়ের আনাবিল আনন্দের আনুভূতি আস্বাদন করা। অন্যান্য অনেক দর্শনেই এই বৈশিষ্টগুলির বেশ কয়েকটিকে পাওয়া সম্ভব; কিন্তু এতোগুলো বৈশিষ্টের সমাবেশ কোথাও ঘটলে তার স্পিরিচুয়ালিটি নিয়ে সন্দেহ থাকে না।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটির (এ কাব্যে কবির ষোলোটি কবিতা রয়েছে) কয়েকটি কবিতা থেকে কিছু কিছু অংশ তোলা যাকঃ

১। ‘কামুক সম্পর্ক ছেড়ে গেলে আসল ভালোবাসা

স্পষ্ট চোখের সামনে। তখন রক্তে অন্য আনন্দ ভরাভর্তি
হয়ে সব ব্যাধি সারিয়ে দেয়, যন্ত্রণা উধাও'। (কবিতা-'ব্যাধি')

২। '…নিভৃতে বন্দি করে পবিত্র উৎস; আজীবন
প্রিয় করুণার কাছাকাছি থেকে শেষ স্বপ্ন
সার্থক হতে দেখে'। (কবিতা- 'গভীর')

৩। 'দুঃখ পেরিয়ে সুখের কাছে যাবি?
যেখান থেকে বেরোবি
সেই দুঃখের খোপে আর ফিরতে হবে না
প্রত্যেক ঘ্রাণে সুগন্ধ, প্রতিটি স্বপ্নে সুদিন'। (কবিতা- 'লং ড্রাইভ')

৪। 'নিজের বিচিত্র সত্তা জেগে উঠে।
ক্রমশ আমার থেকে স্তব্ধতা সরে যায়' (কবিতা-'দিনরাত')

৫। 'সে বিস্ময় চারিত্র নাচাবে না, গড়ে নেবে
অন্য জীবন।
সে জীবন সুখের দিকে তাকাবে না'। (কবিতা- 'সে জীবন')

উদ্ধৃত অংশগুলি একই বাণী বহন করে, কিন্তু এক একটি এক এক ভাবে। এই নানা ভাবগুলো বৈচিত্র, মূল লক্ষ্য স্পিরিচুয়ালিটি।

কবি নীলাঞ্জন কুমারের কবিতায় এই স্পিরিচুয়ালিটি প্রকাশিত হয়েছে মূলত: দু-ভাবে: (১) মোড়কহীনভাবে (2) মোড়কে। যে কবিতাগুলোকে মোড়কহীন বলছি, সেগুলো কাঙ্খিত ধারণাকে ব্যক্ত করে সরাসরি- অন্য গল্প, অন্য আবরণের মাধ্যমে নয়। এই জাতীয় কবিতার মধ্যে পড়ে তার 'দিনরাত', 'লং ড্রাইভ', 'ব্যাধি', 'গভীর', 'ঠিক রাস্তায়' , 'বাজা খোল দশ কোশিতে' কবিতা ছয়টি। যেমন, 'ব্যাধি' কবিতায় মানুষের দুটি ব্যাধি চিহ্নিত হয়েছে- তার একটি 'কাম', অপরটি 'স্নেহ-ভালোবাসার অন্ধত্ব'- দুটি ব্যাধিরই মুক্তির পথ মোহ-নিরপেক্ষ আনন্দ আস্বাদনে:

(১) 'কামুক সম্পর্ক ছেড়ে গেলে আসল ভালোবাসা
স্পষ্ট চোখের সামনে। তখন রক্তে অন্য আনন্দ ভরাভর্তি
হয়ে সব ব্যাধি সরিয়ে দেয় যন্ত্রনা উধাও'। (কবিতা- 'ব্যাধি')

(২) 'সম্পর্ক গভীর হলে দোষহীন জীবন চোখে। সে এক
ব্যাধি, অন্ধত্ব নিয়ে আজন্ম'। (কবিতা- 'ব্যাধি')

'বাজা খোল দশ কশিতে' কাব্যগ্রন্থের বাকি সব কয়টি কবিতাই (একমাত্র 'ব্ল্যাকবোর্ড' কবিতা বাদে) কিছু না কিছুর মোড়কে কাঙ্খিত স্পিরিচুয়ালিটির ইঙ্গিত বহন করছে। এই কবিতাগুলোকে আমরা মাস্কড বা মুখোশ 'কবিতা' বলতে পারি। বড় অংক ক্ষেত্রে কবিতার এই মোড়কটি বর্তমান জীবনের সমালোচনা (criticism of life) তৈরী করেছে। বর্তমান কুৎসিত, কামুক, নির্রথক, যুক্তিহীন, অনৈতিক, সুবিধাবাদী জীবন চর্চার প্রতি মোহকে কবি সপাং সপাং বিদ্রুপের চাবুক মেরেছেন- উদ্দেশ্য ভুলপথগামী মানুষকে সুপথের ঠিকানা দেওয়া- তা মনের স্পিরিচুয়াল উদ্বর্তনের মাধ্যমে।

যেমন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কবিতায় আমাদের অমেরুদণ্ডী , সুবিধাবাদী মানুষের প্রিয়তম দুর্বলতা 'আপস ও সমঝোতা প্রবণতাকে নিছক 'প্রহসন' হিসেবে চিহ্নিত করে কবি লিখেছেনঃ 'কৃষ্ণ হে, আমাদের রাখো এভাবে পাঁঠার অভ্যাসে'। একই রকম বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে সমাজ সমালোচনার স্থানটি কবি তৈরী করেছেন তার 'ঢিচক্যাও', 'লা-জবাব', 'বাজে খরচ', 'তাড়াতাড়ি করুন'', 'সে জীবন', কবিতাগুলোতে। যেমন, 'ঢিচক্যাও' কবিতায় কবির বিদ্রুপের লক্ষ অতিপ্রভাবশালী সম্প্রদায় সমেত সুবিধাবাদী যুবক ও সুবিধাবাদী লেখক সম্প্রদায়ঃ

"... তার চেয়ে বরং
চেটে নেওয়া যাক ওস্তাদের পা, তিনি তোমায়
ধরিয়ে দেবেন সব পেয়েছির চাবি, তুমি আর
বাঘের বাচ্চা হতে যাবে না কিন্তু, তবেই সর্বনাশ,
লুকোনো নকল বাঘনখ বাঘকেও ছাড়ে না"

একই রকম শ্লেষে রচিত 'লা-জবাব' কবিতায় কবি খয়ের খাঁ জীবনের লাগামছাড়া স্বপ্নকে ব্যাঙ্গ করেছেন সুতীক্ষ্ণ বক্রক্তিতেঃ

"... বিভ্রমে ছুট...
লা-জবাব স্বপ্ন আমাদের মধ্যে, তাকে ধরতে গতি বাড়াই"। (কবিতা- 'লা-জবাব')

আধুনিক জীবনের বাধাহীন লোভ-লালসা, অতিগতি, প্রবঞ্চনা, রাজনৈতিক ভাঁড়ামি, নৈতিক মানের স্খলন কিছুকেই ছাড়েননি কবি। বিদ্রুপে লিখেছেনঃ

"গরমিল অংক কষে তার থেকে সঠিক উত্তর
খুঁজে নেওয়ার আজীবন ইচ্ছের জন্য জড়িয়ে পড়ুন
চেনা স্রোতে"। (কবিতা- 'তাড়াতাড়ি করুন')

টি. এস. এলিয়টের 'Hollow Man' কবিতায় বর্ণিত 'ফাঁপা কাকতাড়ুয়া মানুষ, যারা আধ্যাত্মিক ভাবে বন্ধ্যা তাদের কথা স্মরণ করায় 'সে জীবন' কবিতায় ব্যবহৃত 'কাঠপুতুল' শব্দটিঃ

"সব কাঠপুতুল মজা দেবে, ভাবাবে,
তার দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

যারা ভাবে তারা সুখী, বাকি পুড়ে পুড়ে
নিজের ভিতর বিস্ময় পুষে রাখবে।

সে বিস্ময় চরিত্র নাচাবে না, গড়ে নেবে,
অন্য জীবন।
সে জীবন সুখের দিকে তাকাবে না" ।

উল্লেখ্য যে উপরের পঙতি কয়টি আমাদের আধুনিক ব্যাধিকে শুধুমাত্র বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে উন্মোচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আলোচ্য গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা হিসাবে সে ব্যাধি দূরীকরণের পথটি যে মানুষের আধ্যাত্মিক উদ্বর্তনের মধ্যেই নিহিত তা নির্দেশ করে একজন আশাবাদী কবির একটি কাব্যগ্রন্থের যথাযথ উপসংহার হয়েছে। উপরের আলোচনায় তিনটি বিষয় সারা গেলো- প্রথমতঃ নীলাঞ্জন কুমারের কবিতা স্পিরিচুয়াল; দ্বিতীয়তঃ এই স্পিরিচুয়ালিটি সরাসরি মোড়কহীনভাবে ও পরোক্ষে সমাজ, মানুষ, অনৈতিকতার সমালোচনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে; তৃতীয়তঃ তার পোড়খাওয়া কবিতাগুলি বিদ্রুপের অস্ত্রে শক্তিশালী হয়েছে।

এই সব বিষয়গত ও মনস্তত্ত্বগত আলোচনার পাশাপাশি কাব্যশৈলীর আলোচনাও প্রয়োজন। প্রয়োজন কবিকে সার্বিকভাবে বুঝবার প্রয়োজনেই।

শৈলীর এই আলোচনার অন্তত: একটি দিকের আলোচনা কথাপ্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। আর তা এই যে কবির বহু কবিতায় বিদ্রুপ ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে উঠেছে। সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি না।

শৈলীর আলোচনায় প্রথমেই বলতে হয় আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের প্রায় সবকটি কবিতাতেই চিন্তার ক্রমবিন্যাস (development of thought) চোখে পড়ার মতো। খুব সাধারণ বিষয়, চিন্তা বা বাস্তবতা দিয়ে শুরু হলো কবিতা- ক্রমাগত ঢুকে গেলো গভীর গভীরতর রাজ্য- চিন্তার এই বিন্যাসে প্রায় কোনো বাধা, বিপত্তি, ছেদ নেই- আর এই বৈশিষ্টটি কবিতাগুলোকে সাবলীল করেছে। যেমন ধরা যাক কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'লং-ড্রাইভে'র একটি অংশঃ

"আয় মন বেড়াতে যাবি?

যাবি? লক্ষ্যহীন হয়ে-
অরবিন্দ নগর, শরৎপল্লী, মিত্রমাঠ, সেকপুরা,
রবীন্দ্রনগর, কালেকটরি পেরিয়ে পেরিয়ে
ক্রমশ ভাদুতলার পথ ধরে মেদনিপুরকে
টাটা বাই-বাই

যাবি?
বর্ধমান, আসানসোল, বরাকর পেরিয়ে
ক্রমাগত ধানবাদের পথে,
কী দেবে এ যাওয়ায়?
সেই তো আবার ফিরে আসা
আবার নাটুকে হাসাটাসা
চল চলে যাই বিশ্ব পেরিয়ে ব্লাকহোলে
এ গ্রহ বড় ছোটো লং ড্রাইভে
নিদেনপক্ষে একটা ছায়াপথ চাই

দু:খ পেরিয়ে সুখের কাছে যাবি?
যেখান থেকে বেরবি
সেই দু:খের খোপে আর ফিরতে হবে না-
প্রত্যেক ঘ্রাণে সুগন্ধ প্রতিটি স্বপ্নে সুদিন”।(কবিতা- ‘লং-ড্রাইভ’)

কবিতার প্রথম পঙতি মনকে বলছে বেড়াতে যেতে লক্ষহীন হয়ে। মনকে বলা হচ্ছে সামান্য পাড়া-পল্লী প্রথমে পার হয়ে ভাদুতলার পথ ধরে মেদনিপুর পার হতে। তারপর আরও একটু বড়ো জায়গা- বর্ধমান, আসানসোল, ধানবাদ- তারপর নাটুকে হাসাটাসার লোভ অতিক্রম করে (কঠিন কাজ)- ব্যাকহোলে- নিদেনপক্ষে ছায়াপথে, বলা চলে উর্ধ্বাকাশের বাস্তবিকতায়- তারপরে মনকে চকিতে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন: ‘দু:খ পেরিয়ে সুখের কাছে যাবি?’ মুহূর্তে পার্থিব সুখের সীমা অতিক্রম করে কবিতা মনকে দেখাচ্ছে এক অপার্থিব আনন্দভূমি যেখানে ‘প্রত্যেক ঘ্রাণে সুগন্ধ প্রতিটি স্বপ্নে সুদিন।’ এভাবেই বিভিন্ন কবিতাতেই চিন্তার এই ক্রমবিন্যাস কবিতাগুলোর অন্তর্নিহিত শক্তি-সামর্থ্যের সহায়ক হয়েছে।

আলোচ্য কবির কাব্যশৈলীর অপর একটি দিক হলো প্রাত্যহিক আলাপচারিতায় ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ ও মাঝে মধ্যেই কথোপকথনের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে এগুনো। সার্বিকভাবে আজকের কবিতা তার বহুদিনকার অভ্যস্ত শব্দাবলি থেকে অনেক আগেই সরে এসেছে। এই সরে আসার প্রকৃয়াটি অন্যান্য অনেক গুণী কবির

কবিতায় যে রকম সে রকমই প্রায় অন্তিম রেখায় এসে উপস্থিত হয়েছে নীলাঞ্জন কুমারের কবিতায়। ‘ঢিচক্যাও’কবিতাটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কি রকম চাঁচাছোলা ভাষায় কবি তার প্রকাশ খুঁজেছেন:

‘ওহে সামলে, তোমার বাড়বাড়ন্ত লোকে খাবে।
যা দিনকাল, কোন দিন যে তোমার দিকে বাজিয়ে দেবে
ঢিচক্যাও, তারপর শক্ত কাঠ হয়ে হেরে টেরে পগার পার’।

দিনকালের ভাষায় দিনকালকে উপস্হাপিত করেছেন কবি।

আবার বিভিন্ন কবিতাতেই লক্ষ্যনীয়ভাবে উপস্থিত প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার। যেমন, ‘ছোট্ট তিনটি’ শিরোনামের কবিতাগুচ্ছের ‘এক’ সংখ্যক কবিতায় কবির প্রশ্ন:

‘নিশ্চিন্তে আহূতি দেব দুষণীয় দিক
তার ছাই রাখবো কোথায়?’

অথবা ‘উন্মাদ সিরিজ ‘ছয়’ সংখ্যক কবিতায় :

তার কাছে আমরা কি উন্মাদ?
কে বোঝাবে তার যন্ত্রণা?’--- ইত্যাদি।

এই প্রাত্যহিক ভাষার থেকে শব্দ চয়ন ও প্রশ্ন করে করে এগুনো তার অনেক কবিতাকেই যেমন সংলাপধর্মী করেছে, তেমনি নাটকীয় গীতিকবিতার (dramatic lyric) কাছাকাছি নিয়ে গেছে।

আবার লক্ষ্যনীয়ভাবে তার কিছু কিছু পঙতি যেমন প্রবচনের মতো করে উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি অনেক স্থানেই তা প্যারাডক্সিক্যাল-ও হয়েছে, যা পঙতিগুলোর শিল্পশক্তির (artistic strength) ধারক হয়েছে। প্রবচনমূলক পঙতির উদাহরণ হিসেবে পাওয়া যাবে:

১. ‘যাকে যেভাবে চিহ্নিত করবে সে চিহ্ন/ তোমার… ‘(কবিতা-‘চিহ্নিত’)

২. ‘ভুল হতে হতে কতো চিনে নেওয়া যায়’ (কবিতা- ‘ঠিক রাস্তায়’)
৩. ‘যে যতো গভীর তার স্তব্ধতার তল/ সেই জানে…’ (কবিতা- ‘গভীর’)

আবার ‘লং- ড্রাইভ’ কবিতায় ‘নিজেকে নিজের কাছে আসতে গেলে ভয়’ পঙতিটি চূড়ান্ত প্যারাডক্সিক্যাল- স্মরণ করায় আমেরিকান মহিলা কবি এমিলি ডিকিনসনের (১৮৩০- ১৮৮৬- ইং) পঙতি: ‘ Ourself before ourself, concealed-/ Should startled most’ যে পঙতির মাধ্যমে এমিলি ডিকিনসন বলতে চাইছেন এক বিশেষ ভয়ের কথা: ‘… a special kind of terror, which is that of the self observing the self… when the mind turns its vision upon itself, there is no place to hide’ (Source:

'Naked and Fiery Forms: Modern American Poetry by Women- by Suzanne Juhasz')। নীলাঞ্জন কুমারের আর একটি প্যারাডক্স পাওয়া যাবে 'ছোট্ট তিনটি' নামক কবিতায়:

'ঘুমের ভেতরে প্রতিদিন হত হই
যখন জেগে উঠি
তখন অন্য জন্মদিন'।

আলোচনার এই বিভিন্ন দিককে একত্রিত করে বলা যায় 'বাজা খোল দশ কশিতে' কাব্যগ্রন্থের কবি অবশ্যই স্পিরিচুয়াল, যে কবি আধুনিক জীবনের সামাজিক ও মানসিক অবক্ষয়ের সমাধান খুঁজেছেন আধ্যাত্মিক উদ্বর্তনের মধ্যে। কবি স্পিরিচুয়াল, বিপরীতে অদ্ভুতভাবে বিদ্রুপ তার হাতে ব্রহ্মাস্ত্র। কবিতা মেদহীন, অনায়াস, যদিও কখনো প্রভার্বিয়াল ও প্যারাডক্সিক্যাল, তবে বহু অলংকারের ঝঙ্কার বর্জিত, ঢেউ স্তিমিত , শিটশিটে মেদহীন, অথচ ভেতরে গভীর যা গভীরে ভাবায়।

ক বি তা

জন্ম মৃত্যু

সন্তোষ সিংহ

বসতবাড়ির ভেতর তুমি সত্যি বসত করো?
নাকি সেটা খোলস ভেবেই অন্য বসত গড়ো-
খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা অন্য ভিটেমাটি
সহস্রবার না মরলে কি বুজতে তাকে খাঁটি?
মরণ দিয়ে জন্ম লাভ নাইবা যদি হলো
বসতবাড়ির সার্থকতা সত্যি আছে বলো?
যারা শুধু জন্ম জানে মৃত্যুকে ভয় পায়
মৃত্যু তাদের সত্যি মারে মজ্জায় মজ্জায়!

অনুমতি দিন, মহারাজ

রূপক সান্যাল

আজ আমিষ খেতে চাই- অনুমতি দিন, মহারাজ
যদি অনুমতি হয় তবে নিঃশ্বাস নিতে পারি?
একটু জল খেতে পারি, মহারাজ? প্রচণ্ড খিদে—
একমুঠো ঘাস খেতে চাই, দয়া ক'রে
অনুমতি দিন, মহারাজ।

কশেরুকার প্রতিটি খন্ড দিয়ে
নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছি,
চালকলা-বাতাসার উপর আমার মগজ—
মহারাজ, আপনার কি রঙ পছন্দ?
আমার সাদা জামা আছে, পরতে পারি?
অখুশি হবেন না তো?
আমার ডান হাঁটুতে ব্যথা, সবল বাম দিকে
যদি ভর দিয়ে দাঁড়াই, রেগে যাবেন?

ঠাকুর্দা মৃত্যুশয্যায়, শিয়রে যমের দূত,
শ্মশানযাত্রীরা ধৈর্য্য রাখতে পারছে না,
কিন্তু আপনার অনুমতি আসেনি, মহারাজ
ঠাকুর্দা যদি ম'রে যায়, আপনি অসন্তুষ্ট হবেন?
আপনার অনুমতিহীন মৃত্যু, সে যে ভয়ানক পাপ!

মহারাজ,··· মহারাজ—
প্রতিটি চুম্বনের জন্য অনুমতি দিন
প্রতি রাতের সহবাসের জন্য অনুমতি দিন
আমার সন্তানের জন্মের অনুমতি দিন-
আপনার অনুমতিহীন আমার এই ব্যর্থ জীবন,
একটু অনুশোচনার অনুমতি দিন, মহারাজ ...

সৃষ্টি

অমর চক্রবর্তী

বাথরুমের দেয়ালে লেখা কাঞ্চন+কুন্তলা
সৃষ্টির এ কেমন অবহেলা!
কবির ভাষায়, 'কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছো!'

দেখি পাখির ঠোঁট থেকে জন্মবীজ
পড়ে আছে কার্ণিশে দেয়ালের ফাটলে
বেড়ে উঠছে বট পাকুড়
কারা যেনো ধরে ধরে
ওদের বিয়ে দিচ্ছে উপবনে
কবি বৃষ্টি আর সৃষ্টির কথা ভাবতে ভাবতে
রাস্তা পার হয় আনমনে...

সৃষ্টির কি বিশৃঙ্খলা!
ডাস্টবিনে উন্মাদ বীজ, কামোন্মাদ
নড়ে চড়ে অপরিণত ভ্রূণ
আলোকিত হলোনা ময়ূরপীঠে কার্তিক
সবাইকে হতে দেয়না জগদ্ধাত্রী।
অমানবিক ধাক্কায় পাল্টে যায় আকাঙ্ক্ষা-
ধর্নায় বসে প্রেমিকের বাড়ির উঠোনে
মোহন বাঁশি শুনতে যায় আদালত প্রাঙ্গণে!

সৃষ্টির এই যে খেলা আসলে অবহেলা
সে নয়তো কুসুম ফোঁটানোর প্রস্তাব
কেন যে বোঝেনা কাঞ্চন+কুন্তলা!

ক্ষতিকারক

নীলাঞ্জন কুমার

ক্ষতিকারক জেনেও এক গাল হেসে
মানুষ বলছে, যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে।

চোখের সামনে তেড়ে মারতে আসা
কাউকে দেখে মানুষ কেমন আশ্চর্য চুপ!

এই যখন পরিস্থিতি তখন
ক্ষোভ বিক্ষোভ কোথায় উধাও!

সব যখন উল্টো দুরবিন দিয়ে দেখা হচ্ছে
তখন ভুলকে ঠিক বলতেই হবে।

ক্ষতিকারক জেনেও ফিরিয়ে আনি দুঃসময়,
কার কি করার আছে ...

জানা নেই

শৈবাল মজুমদার

পাতারাও জানে- শিকড় রয়েছে সাথে
স্নেহ জল দেবে প্রয়োজনে
আমার শিকড় নেই
ছিঁড়ে গেছে কবে সেই দূর শৈশবে
স্বাধীনতা নামে এক প্রহসনে

সেই থেকে জলহীন স্নেহহীন কুটিরবিহীন
গরীবের না পাওয়ার অশালীন খোলা হাটে
ছিন্নমূল আমার কবিতা
সারা গায়ে ধূলো মেখে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে
রাত হলে কোথায় যে যাবে !

নৌকা অভিযান

উদয়ন চক্রবর্তী

আমি জানি শ্যাওলা ধরা নৌকাই
আমাকে নিয়ে যাবে
যেখানে যাবার ভেসে ভেসে দুলে দুলে
আর আমি তখনও পার খুঁজবো
সন্ধ্যা তারার চোখে চোখ রেখে

রাতের অন্ধকারে যতবারই চুমু খেয়েছে
পৃথিবীর বুকে জোৎস্না
ততবারই যৌন সুখে পৃথিবী পাশ ফিরে শুয়েছে
নৌকা হেঁটে গেছে অনন্ত অন্ধকারে

আগ্নেয়গিরির হৃৎপিণ্ডের অস্তিত্ব
পৃথিবী নিঃশব্দে ধরে আছে
আমরা সাপ-লুডু খেলছি সুখ দুঃখের ঘুটিতে
ছক্কা পুট বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে খুশি মতো
কেউ মাটিতে কেউ উঁচুতে শুন্যের গুণিতকে।

শঙ্খের ধ্বনি

সঞ্জয় সোম

কবি, ঘরে বাইরে আপনি একা

যাদের পিঠ চাপড়াবেন
তারাই চাবুক কষবে পিঠে

আপনি ছাড়া কে জানাবে দিক নির্ণয় ?
কবি আপনি,শঙ্খ শুভ্র

আপনার শঙ্খের ধ্বনিতে কেঁপে উঠছে বাতাস
কাঁপছে ওদের বুক
ওরা তো শাসানির আঙুল তুলবেই

আমাদের সময়ের শঙ্খের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে
আমি, আমরা, আমরা সবাই সাহসে বুক বেঁধেছি

আমরা একজন দুইজন দশজন শতজন সহস্রজন
দেখছি চোখ খুলে

দিনের কবি, জোরে আরও জোরে বাজিয়ে যান
আপনার হাতের শুভ্র শঙ্খ

আপনি কবি, দ্রষ্টা, দধীচি আপনি
আপনার শঙ্খের ধ্বনি, হাড়ের শব্দ-

আমাদের সময়ের কথামালা হয়ে ঘুরবে
আমাদের সবার মুখে মুখে

কেন যে?

প্রতীক মিত্র

পদক্ষেপ নড়ে যাচ্ছে।
জ্যামটা নাটকীয়ভাবে রঙীন।
ট্রাফিকের আলোয় চোখ গেলেই ঘুম
সন্ধ্যের বাধ্য হাওয়ায় মিলছে জামিন।

লক্ষ্য বড় সামান্য এখন
চেনা পরিচিত ঘর।
ভীড় থেকে ফেরালে মুখ অন্তর্দহন,
অন্ধকারগুলো শুধু তৎপর।

জাহির করার ভীষণ ধুম
জলের বাইরেও মাছ জল ঠিক খাচ্ছে।
স্বতঃস্ফূর্ততার কথা উঠলেই ভেস্তে যায় আয়োজন
সন্ধের বাধ্য হাওয়ায় তবু কেন যে মিলছে জামিন?

এখানে জীবন থমকে আছে

ঈশিতা পাল (ব্যাঙ্গালোর)

ঘরের জানালায় গরাদে রোদেরা মাথা ঠোকাঠুকি করছে,
বাইরে গাছের পাতায় পিঁপড়েদের ভালবাসাবাসি-
শুঁয়োপোকারাও প্রজাপতি হওয়ার আনন্দে মশগুল,
শুধু আমি রোজকার মত হুইলচেয়ারে বন্দি!

কার্নিশে পায়রাদের বকবকম শুনি সারাদিন,
কড়িকাঠে টিকটিকিদের ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা দেখি-
আমার চারপাশে জীবন নদীর মত বয়ে যাচ্ছে,
শুধু আমি থমকে আছি অনেকগুলো বছর।

যত কোলাহল সব চৌকাঠের বাইরে,
আমার সঙ্গী নিস্তব্ধ এক মরা বিকেল-
নতুবা সারা দুপুর চোখ বুজে শব্দের সন্ধান,
খাঁ খাঁ দুপুর জুড়ে টুপটাপ পাতা খসে পড়া।

রাতগুলো আমারই মনের কালো রঙের পোঁচ,
রঙিন স্বপ্নেরা যেন কবেই নিরুদ্দেশে গেছে-
রাত পেরিয়ে জীবনের কোলাহল পৃথিবীময়,
শুধু আমি জানালার রোদ্দুর দেখি সারা বেলা জুড়ে।

ব্যতীত

দেবার্ঘ্য সেন

সাবধানতা, সুমতি, মস্তিষ্ক শুশ্রূষা
যেভাবেই বলি না কেন
অচিরেই কে যেন আমাকে
নিয়ে যায় ভালোবাসায়।

সাদা পাতার আশ্রয়ে এই জীবন
অসম্মানকেও সম্মানে বরণ করেছে,
মুখ বুজে থাকতে থাকতে শিখে নিয়েছে,
দেহ-উপাসনার নিবিষ্ট গ্রন্থি সংকলন- কণ্ঠমূল।

অপেক্ষা

বন্দিশ ঘোষ

ওহে, সর্বহারার কি আর থাকে গো দেহটুকু ছাড়া!
দূরে গেলে নিঃশ্বাস গোপনে থেকে যায়
গাছপালা ঘরবাড়ি সবাই নিঃশব্দ,
একটু বাদেই ঝড় উঠবে -
এক... দুই... তিন... চার...
গোনাগুনি শুরু,
একলা পৃথিবী অপেক্ষা করছে
কাঁচা রাস্তা অপেক্ষা করছে
দলের পতাকা, সঙ্ঘ-সমিতি অপেক্ষা করছে -

কালবৈশাখ

সোনালি ভট্টাচার্য মুখোপাধ্যায়।

বসে ছিলাম। এক আকাশ ঝলসানো রোদের
জ্বালা নিয়ে। তেষ্টায় কাঠ।
একা ঘর । তেতে যাওয়া পথ
আর ঝিমিয়ে পড়া পাতা।
আর এক পৃথিবী ক্লান্ত অবসাদ।
তুমি বৃষ্টি পকেটে নিয়ে এলে।
'আহা!'বলে, হাঁফ ছাড়ল গাছপালা; সঙ্গে আমিও।
খুচরো খুনসুটির চুরমুর
আর মিষ্টি আইসক্রিমের সঙ্গতে বৃষ্টি-
দুপুরের গন্ধ মাখা রিমিঝিম আদরের সিপিয়া এলবাম-
এই সব মেঘ ও মল্লার,
আর মোলায়েম মুহূর্তের আশ্লেষ যাপন;
নেহাৎ অকাজে ফোটা বেলকুঁড়ি দিন,
ছায়ার চাদরে ঘেরা অনায়াস মেঘলা বৈশাখ।

ভাওয়াইয়া

সুবীর সরকার

পাথারবাড়ি থেকে যে গান উঠে আসে
বাওকুমটা বাতাসের ভেতর
যে গান জেগে থাকে
তার নাম ভাওয়াইয়া-
গো মহিষের গাড়ি।
অনন্ত গাড়িয়াল।
ছাইতন কাঠের দোতরা।
আর অনেক নদীর জলে
ভেসে যান বাইচার ভাইয়া

তুমি ফিরলে একা

দেবাশীষ সরখেল

এই সেই মিনার যেখানে
কবিগুরু ও বিনয় দাঁড়িয়ে ছিলেন একসাথে
যেখানে অপরাহ্ন বেলায় ভাষণ চলবে।
ঠাঠা রোদ্দুর- কলকলিয়ে ঘাম।
লাল লহর- গরম গরম স্লোগান।
অনেকেই ছিলেন সাথে ।
কেউ গেলেন গঙ্গাস্নানে।
কেউ গেলেন দক্ষিণেশ্বর ,কালীঘাট ।
সংগঠক প্রেমিকার চোখে মহানগর দেখবেন।
বলে গেলেন, ‘দেখবেন কেউ যেন না পালায়’।
দেখলুম সকলেই পালিয়ে গিয়ে
যে যার মতো বিপ্লব করছে।
ভাষণ চলছে, দেখতে দেখতে সন্ধে;
আলো জ্বলে উঠলো চারদিকে।
ঘুম পাচ্ছে খিদে পাচ্ছে।
রক্তের পাহাড়প্রমাণ উন্মাদনা
অবসাদ, ঘুম ও খিদে রুখতে পারেনি।
যাওয়ার সময় ছিলেম অনেকে,
কিন্তু ফিরলেম একা একা।

ঋভু চট্টোপাধ্যায়ের দুটি কবিতাঃ

(১)

তবুও উলম্ব অধ্যায়

মনে নেই তবুও উলম্ব অধ্যায়
পাশাপাশি অক্ষররেখা গুণে খুঁটে খায়
নিরীহ সময়রেখা। হাতের তালুতে মুছে যাওয়া ভাগ্য
আর দেওয়ালের গায়ে কাঁচা পাকা দাড়ি
একই দ্রাঘিমার পাশে হেঁটে চলা দুটো রাস্তা।
একটু ছায়া হলে বসে কয়েকটা
জিরানো মুহূর্তের সাথে কয়েক ছিলিম।
এখানেই সব তুলে রাখা অথবা নামানো,
মাঝে গণিত না থাকলেও সব অন্ধকারেই লেজ থাকে।

(২)

কে বলেছে ইতিহাস

এভাবেও তো আসা যায়,
ভোর ভোর পেট পাতলা রোদের সাথে
অথবা চাঁদ নৌকায় আধখাওয়া সন্ধ্যাডানায়।
ওপ্রান্তের বাতাস সতেজ ফুসফুস শুঁকে,
উড়ে যাবে অক্ষরবৃত্তে।
অবশ্য ইতিহাস এসবের সাক্ষী থাকে না।

আবার তোমাকে বেণীমাধব

ঊর্মিলা চক্রবর্তী

তুমি ওকে চিনতে পারলে না বেণীমাধব।

সুন্দরী বৌ নিয়ে রাস্তা হাঁটতে তোমার চোখ
থমকে থেমেছিল কালো কুচ্ছিত যে নারীর মুখে,
আজ সে প্রণয়ভীরু কিশোরী নেই আর। হারিয়ে গেছে
পুরুষের দাক্ষিণ্য চেয়ে কেঁদে যাওয়া মেয়েটি।

তোমাকে চাইবার মতো সাহস তো কখনও হত না তার,
তুমিই বুনেছিলে অলীক আশার বীজ।
কৌতুকের নিষ্ঠুরতা পুরুষকে সহজেই মানায়।
অনেক চোখের জল ঝরিয়েছিল নির্দোষ কৌতুক।
তবু সেটুকুই বোধ করি ধিকিধিকি জ্বলেছিল বুকে,
শুষে নিয়েছে চোখের জল।

ভিতরে যখন শুধুই আগুন, তখন সাধনা শুরু,
মেয়েমানুষ থেকে নারীমানুষ হবার দুরূহ পথচলা।
মুখে বুলোয়নি ব্যর্থ রূপটান, অশ্রুজল মুছে
কাজলহীন শুকনো চোখে চেয়েছিল পৃথিবীর মুখে,
পথশিশুদের বুকে নিয়ে ভুলেছিল সংসার স্বপ্ন।
ওদের শিক্ষাব্রতে কত মানুষের সঙ্গে হাতে হাত,
সংগ্রামে ভাঁজ পড়েছে চামড়ায়।

আজ ওরা ধরে বসেছিল, গল্প বলো দিদি।
তুমি যেতে যেতে দেখলে এক নারী,
তাকে ঘিরে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালোবাসা, নির্ভরতা,
চালচিত্রে আলপনার মতো,
স্নেহের গর্জন তেল লেপে গিয়ে
অলৌকিক বিভায় দীপ্ত তার তরুণ মুখ।

অন্য জন্মের পার থেকে সে আজ তোমাকে
খেয়ালই করেনি, বেণীমাধব।

ধূসরতা একটি প্রহর মাত্র

হাবিবুর রহমান

কালবৈশাখীর মেঘ সরে যাবে এক নিমেষে,
উঠবে প্রখর সোনালি রোদ।

খুঁজে নেবো আলোর দেশ
ধূসর ক্রান্তিরেখা পেরিয়ে প্রত্যুষে।

নীল খিলানে তোমার হাসিমুখ বুনো ফুল,
বেনো জলে সাঁতরে পৌঁছে যাবো কল্লোলিনী তীরে।

বসন্ত অলস দুপুরে ধ্রুপদী সঙ্গীত উড়ন্ত কোকিলের,
বিদগ্ধ পাঁজরে অমলতাসের ছোঁয়া আর মিষ্টি সুবাস বেনামী ফুলের।

শতাব্দীর ধোঁয়াশাগ্রস্ত সর্পিল বাঁক থেকে খুঁজে নেবো ঋজু পথ জ্যামিতিক সরল রেখায়।
ট্রাফিক সিগন্যালে গ্রীন লাইটের অপেক্ষায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছি। ধূসরতা একটি প্রহর মাত্র।

গন্ধ বকুল আগুন পাখির ঠোঁটে, নিভে যাবে জ্বলন্ত কাঠ কয়লা হাওয়ার চুম্বনে,
ধোঁয়ার কুণ্ডলী মিশে যাবে নিশীথ সূর্যের আলোক বিন্দুতে।

স্পর্শ

তীর্থঙ্কর সুমিত

সময় বয়ে যায় সময়ের সঙ্গে
অপেক্ষার তাজমহলে
ভালোবাসার প্যারাসিটামল প্রতি ঘরে
সময় কেটে যায় সময়ের নিভৃত যন্ত্রনায়
আপামর জনসাধারণ জানে
ফেলে আসা ব্যর্থতার ইতিহাস
কলকে গাছের ডালে পাখি এখনো বাসা বাঁধে
রাত পেঁচারা প্রতিনিয়ত আসে আমার ঘরে
বিষন্ন কবি জীবনে ডুয়ার্সের নদী
একাই তরাইকে স্পর্শ করে।

উপত্যকা

অরুণাভ বেরা

জাম পাতার ছায়ায়
পাখির বাসার খড়কুটো
ইতিউতি ছড়িয়ে পড়ে।
নবমী নিশির চাঁদ আর
তির তিরে কুয়াশার বলয় আজ উপত্যকায়।
দূরে মিলিয়ে যায় কৃষক-বধূ...
সন্ধ্যায় শঙ্খ ধ্বনি,
শিশিরের নীরবতায় ঢাকে
পাকা ধানের শীষ।
অরণ্যের ধারে কাঠ কুটোতে
আগুন জ্বালিয়েছে এখন।
উত্তাপে স্নিগ্ধ হবে চেতনা,
ভুখা পেটে প্রতিবাদের মতন
সচকিত আজ স্বপ্নের ক্ষেত।

সুখস্মৃতি

ভুবন সরকার

উড়িয়ে দিলাম জীবনবোধের বেহিসাবী খাতার পাতা
তবু শব্দের খড়কুটোর মত জড়িয়ে থাকে সুখস্মৃতি,
পাশাপাশি পথচলার খুচরো সঞ্চয়, কিছু উষ্ণ আবেগ
বিপন্ন গাছের শাখায় নতুন পাতার তৃপ্তি সুখের মতো,
দিশাহীন নাবিকের খুঁজে ফেরা অভিমানী অভিমুখ ।
নিঃসন্দেহে ফিরে যাও নিজস্ব ঠিকানায় নীলাঞ্জনা,
মেঘমেদুর বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে মেঘমল্লার রাগ
দুঃখের মেঘেরা ঘনিভূত হয় সাহারা বুকের খাঁজে
এই আঁধারের আলোটুকু নিয়েই আমি হারাব নিজেকে
প্রবল ধারায় নেমে আসা তোমার কাঙ্খিত চাওয়াতেই।

নিঝুম রাতের কান্না

রথীন পার্থ মণ্ডল

হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙে মাঝরাতে
আলো জ্বালতেই দেখি হৃদয়ের গভীর থেকে
পাখা সম্বলিত পিঁপড়েরা আলোর দিকে উড়ে যায়
যেখানে মৃত্যুর সাক্ষাৎ নিশ্চিত জানে,
জেনে ইচ্ছে গুলো মরে যায়।

বাথরুমের ট্যাপ থেকে জল ঝরার শব্দ শুনি শুয়ে শুয়ে
ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে যায় স্বপ্নগুলো!

বেওয়ারিশ কুকুর বিলাপে জানায় যত কষ্ট
ট্রাকের চাকার নীচে পিষ্ট কবিতার ব্যাকুলতা
কাঁদে অসহায়, তবু জেগে থাকে বিদগ্ধ মন
মুখ থুবড়ে নর্দমায় পড়ে অনুভূতি।
মাঝরাতে প্রায়ই আমার ঘুম ভাঙে আজকাল।

লক্ষ্যবস্তুর দেওয়ালে

অজিত কুমার জানা

অসুস্থ সময়ের শরীরের
পাশে বসে রাত জাগি।
ভাড়াটে নার্স নয়,
গর্ভধারিনী মমতাময়ী মা।

জানি ও বড় অসহায়,
আমার সান্নিধ্যের প্রত্যাশায় কাতর।
আমারই হাতে অমরত্বের ওষুধ,
ঘুমের খিড়কি দরজার তালা,
হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস খুলে
আবার জুড়ে দেয়।

অসুস্থ সময়কে কোলে নিয়ে,
স্নেহের হাত বুলিয়ে,
খাওয়াই আর ঘুম পাড়াই,
জানি সময় কত দামি।
ধারাপাতের প্রথম সংখ্যাটা,
গাঁথা আছে লক্ষ্যবস্তুর দেওয়ালে।

মহুল পড়ে

শ্রীকান্ত মাহাত

মহুল পড়ে টুপ্ টুপ্
ও দিদা চাড়ে উঠ।
বেলাটা বাড়লে হবেক
তখন হরির লুঠ।
দিদা বলে, লে টকা লে টুপা
যাবো লো একা একা।
টুপাকে টুপা টকা ভরবো
মাথায় লিবো ঝাঁকা।
ঘরে আনে মহুল শুখা
করবো যতনে।
হাটে গেলে পয়সা পাবো
ওই মহুল বিনে।
মহুল সিঝা কচড়া পিঠা
খাতে লাগে মিঠা।
পরব তিহার হলেই
লাগে টুকু মহুলাটা।

যন্ত্রণা

নরেশ মল্লিক

যন্ত্রণা হিম বেয়ে পরে টুপ টুপ করে।
আবছা সূর্য উঁকি দেয় পুব আকাশে,
হলদেটে রঙ ফ্যাকাশে হয়।
কুয়াশায় ভেজে ফুটপাতের মুখগুলো -

পাথরে হোঁচট খায় স্বপ্ন,
আর গুমরে কাঁদে বর্তমান।
যন্ত্রণা দানা বাঁধে,
ধোঁয়া রাশি কুণ্ডলী পাকিয়ে
ওঠে একটু একটু করে, সূর্যকে ঢাকার জন্য।

এলোমেলো বাতাস কখন যে টর্নেডো
হয়ে আছড়ে পড়ে ঝুপড়ির ঘরগুলোতে বোঝা যায় না।
রাতের অন্ধকার পথ হারায় নির্বিচারে,
ফুলের পাপড়িগুলো খসে পড়ে --
আর সারা শরীর জুড়ে জলছবি এঁকে যায় যন্ত্রণা।

ছায়া ও রং

শিপ্রা পাল

ছায়াও কখনো ভারী হয়ে যায়। রাস্তা খুঁড়তে খুঁড়তে যখন তলিয়ে যাচ্ছে, ভীষণভাবে আশ্রয়হীন আর তখনই এটা-ওটা আঁকড়ে ওঠার চেষ্টা।

আজকাল মাটির কাছাকাছি যাবতীয় বড়ই কাছে টানে, উত্তরের জানলা গলিয়ে পাশেই দো'চালা ঘরে জনা কতকের বাস। এই শহরে এ সত্যিই দুর্লভ, কুয়োপাড়ে বালতিতে জল তোলার আওয়াজ কিংবা গাছের ডালে ঝুলে থাকা দোলনা, কখনও লাকড়ির রান্নায় ধোঁয়া-ওঠা গন্ধ আর নির্জন দুপুরে হাতপাখার তরঙ্গে শিউলী ফুলের বোঁটা শুকানো রংমশল্লা।

কতোটা রঙ দেবে বা নেবে সেটা তোমার ওপর, বৃষ্টি পড়ছে শিশির পড়ছে বিদ্যুৎ পড়ছে তারা খসছে রোদ পড়ছে আর এই মুহূর্তে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝরছে আমার শহর জুড়ে।

গ্রাম্য কিশোরী আড়ালে প্রথম প্রেমের আস্বাদন নেয়, ওপরতলায় হৈ-হুল্লোড় নীরব হয় তেতো প্রণয়ের ভোরঘুমে।

জল হাতের কনুই গড়িয়ে ঝুলবারান্দায় দিনের সূর্যকে ছুঁয়ে প্রতিধ্বনিত হয়, 'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ ...'।

এ সময়ের রবীন্দ্রনাথ

চৈতালি ধরিত্রীকন্যা

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঠাকুর!
আজ জাগ্রত সমস্ত মাইক্রোফোন- কিন্তু রবিবাবু
করোনার এমন বৃহত্তম দীর্ঘতর মহামারী আপনি দেখেননি।
এই অভিজ্ঞতায় আপনার থেকে এসময়ের মানুষ একটু এগিয়ে
আপনি বসন্ত রোগকেও ভয় পেতেন।
'কোথা হা হন্ত ওরে বসন্ত আমি বসন্তে মরি'
এসময়ের চিহ্ন যদি আপনাকে সৌভাগ্য দিত অথবা দুর্ভাগ্য?
আপনি বোধ হয় ঘোষণা করতেন
চারদেয়ালে থেকেই ছবিতে ছবিতে ভরিয়ে দাও
ডিজিটাল বিশ্ব আপনাকে শুনতো
আপনি বলছেন মনের ওপর হাত রাখো
আরেক হাতে ঐ হাতটা ধরো।
একের মধ্যে বহুত্ব তুমিই খোঁজো।
এই বিশ্বমহামারীতে যারা বেঁচে যাবে অথবা বেঁচে যাবো
আপনার গলায় মাল্যদান ঠিক করে যাবো রবিঠাকুর!
এরই নাম অমরত্ব।

প্রতিকৃতি

মানস মজুমদার

অলকানন্দার জলে ভেসে ওঠে
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা ভালোবাসার মুখ
ছন্দে বর্ণে গন্ধে বেজে ওঠে সুরের আলপনা
অথবা সুরের আলপনা ঝঙ্কৃত নূপুর হয়ে যায়
তুলনাহীন ওই মায়াবিনী রূপ
হাওয়ায় ওড়ে একরাশ উদ্দাম কেশমালা
অঙ্গে ওড়ে তরঙ্গায়িত শাড়ির আঁচল
চূর্ণ কুন্তলে রুমঝুম বৃষ্টি ঝরে
হাস্যমুখে খেলা করে বৃষ্টির মুক্তোদানা
বিস্মিত হই সম্মোহনী রূপের কাছে
হৃদয়ে বৃষ্টিভেজা ঝোড়ো হাওয়া
নূপুরের নিক্কন তুলে ঝড় হয়ে যায়-
মেঘ ও রোদ্দুরের লুকোচুরি খেলা
ভিঞ্চি সাহেবের প্রতিকৃতি নাড়িয়ে দেয়
বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাই
চন্দ্রমুখ ভোলা বড়ই কঠিন
হৃদয়ে রূপটান লাগিয়ে ছড়িয়ে যায় ছায়ায় মায়ায়
রুমঝুম ঝুমঝুম শব্দে বারবার ফিরে ফিরে আসে।

বর্ষার চিঠি

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

কুয়াশার মতো অন্ধকার নেমে আসছে ক্রমশ
ভেজা পৃথিবীর বুক চিরে।
রেশমের মতো পলকা বৃষ্টির ছোঁয়ায় ভাসতে ভাসতে
এসে দাঁড়িয়েছি নির্জন মেঘের বারান্দায়।
ধোঁয়ার কুন্ডুলিতে ধূসর হয়ে আসছে দিগন্ত।
রামধনু লিপিতে লিখে চলেছি ভেজা প্রেমের মহাকাব্য।
বিগত শ্রাবণে জলের প্লাবনে
এখানেই ছিলো আমাদের স্পন্দনহীন প্রতিবিম্ব।
মনে হয়েছিল অতলান্ত মহাসাগরে
এ যেন এক বিচ্ছিন্ন বদ্বীপ।
আবারও শ্রাবণ আসছে থৈ থৈ মনভূমি পেরিয়ে।
কাচের জানালায় বৃষ্টি সুরে তোমার নাম ধরে ডাকবে।
জানালার ফাঁক দিয়ে দেখবে কদমের নিচে দাঁড়িয়ে
ভিজতে ভিজতে খুঁজে চলেছি আমি অভিসারি রাধাকে।

'শাদ্বল' ই-পত্রিকায় লেখা দেওয়ার ঠিকানা ও নিয়মঃ. ১. যে কোনো ছোটো দৈর্ঘ্যের লেখা লেখককে প্রথমে এম. এস. ওয়ার্ডে লিখতে হবে। তারপর তা ডক্স ফাইল হিসাবে পাঠাতে হবে। পি. ডি. এফ হিসাবে নয়। বিকল্প হিসাবে নোট প্যাডে লিখে কপি পেস্ট করে পাঠাতে পারেন। এতে অবশ্য লাইন ফরম্যাট ভেঙ্গে যেতে পারে। জি-মেল বডি বা ওয়াটসয়্যাপ বডিতে লিখে পাঠানো যাবে। সব থেকে ভালো এম.এস.ওয়ার্ড ডক্স ফাইল। 2. পাঠাবেন এই জি-মেল বা ওয়াটসয়্যাপ নম্বরেঃ (ক) শাদ্বল হোয়াটসঅ্যাপ নংঃ ৯৫৬৪৬৩২৪০৭ (খ) শাদ্বল ই-মেলঃ shadwalpatrika@yahoo.com

মধ্যবিত্ত

অশেষ গাঙ্গুলী

আমরা মধবিত্ত-
সমাজের সকল নিয়ম আর শাসনে শাসিত শ্রেণি।
যাদের প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত কিছু পাওয়ার আশায়
অনেক কিছু হারিয়ে ফেলতে হয়।
প্রতিদিন ভোর হয় কিছু পাওয়ার আশায়
রাত হয় অসংখ্য না পাওয়ার যন্ত্রণায়।
যাদের সবাইকে সম্মান দিতে হয়
কিন্তু সমাজের থেকে সম্মান পায় না।
মধ্যবিত্ত জীবনে হাজারো স্বপ্ন আছে
বাস্তবে যার কোন পরিণতি নেই-
যাদের জীবনে যন্ত্রণা আছে
কিন্তু যন্ত্রণার সময় পাশে দাঁড়ানোর মতো মানুষ নেই।
মধ্যবিত্ত জীবনে সমাজের স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রতি
হাজারো রাগ থাকলেও প্রকাশের উপায় নেই।
তাদের জীবনে চলার পথে অসংখ্য চিন্তা থাকলেও
চিন্তার উপসম নেই কোনো।
তবুও তারা বেঁচে থাকে
হাজারো স্বপ্ন পূরণের আশায়।

আমার মন খারাপের দিনে

সুবীর ঘোষ

পাথর বেষ্টিত রাত্রি, দিন এলে ক্ষতচিহ্ন বাড়ে,
অশান্ত মনের তীরে নোঙর পায় না নাবিকেরা
হতমান বণিক তবু যেন একবার শেষ চেষ্টা করে;
বাণিজ্যবিফল তরী- তীরভাঙা ঢেউ- সুরহীন গান।

আমার মন খারাপের দিনে তারারা কাঁপে।
আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্বসংসার অভুক্ত থাকে।
বর্ণময় মেঘের বিকেল অস্তিত্ব হারায় অন্ধকারে।
প্রবাসী জীবনের আগুন জ্বলতে থাকে সর্বক্ষণ।

ধানরঙা জমিতে কত রক্তপাত দেখেছি সেদিন—
হারিয়ে যাবার ভয়ে শালিকের ভয়-পাওয়া কান্নায়
কখন ভরিয়ে দিয়েছি চারদিক
দর্শক জনতারও স্মরণে আসে না।

মেঘ-শ্রাবণে

বন্দনা পাত্র

দুঃখ ভেজা শ্রাবণ ছিল
বাউন্ডুলে হয়ে-
বৃষ্টি ভেজা বাতাস এসে
তৃষ্ণা দিল ধুয়ে-
অসীম দূরে মেঘের সীমা
ঐ যে ঐ শ্যামল হৃদয়ে।
লাগাম ছাড়া আষাঢ়ে মন
উজ্জয়িনীর কবির কথায়
প্রিয়ার কাছে দূত পাঠায়
যেথায় প্রিয়ার নির্বাসন।

এলোচুলে কোমর বেঁধে ব্যস্ত কাজে
অশ্রুভরা হৃদয় জলে বিরহটাকে
মেঘমল্লারের মিড় দিয়ে সে
বকুল ফুলে বেণী বাঁধে-।
বাউন্ডুলে শ্রাবণ মেঘদূত হয়ে
বাদল হাওয়ায় প্রিয়ার কাছে
পৌঁছে দেয় নিভৃত হৃদয়ে,
বর্ষা আসে আকাশ মাঝে
অনন্ত আকাশ বাঁশি বাজায়
এমনি করেই শ্রাবণ ভেজায়।

শারদীয়া

অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

কতদিন ধরে আমি নীল বৃষ্টিতে ভিজিনি তো!
তোমার লাল চোখের চাহনির জবাব আমার নীরবতা।
পাখির হলুদ পাখায় ভর করে
যেদিন রাত নেমে আসবে সেদিন আমার মুক্তি!
শিউলির গন্ধ ভেজা উঠোন পেরিয়ে,
কাশ ফুলের উষ্ণতা গাঁয়ে মেখে ফিরতে চেয়েছি আমি।
পারিনি! তোমার শাসন শোষন বড় ছিল তখন।
মেখলা চাদর পরা পাহাড়িয়া সুন্দরী শরতের কুয়াশা
রঙিন আবির লুকিয়ে এনেছে আমায় মাখাবে বলে।
তুমি এসে সামনে দাঁড়ালে। আমি এগিয়ে এসেছি,
আমার সবুজ হাতখানা বাড়ালাম ভোরের শিশিরে-
শরৎ সূর্যের সোনালি আলোয় ভিজে গেলাম,
ভেসে গেলাম আর ভাসিয়ে দিলাম তোমায়।
শারদ প্রভাতে শারদীয়া গানে আরো
কিছুকাল ভাসব বলে রইলাম আমি জেগে!

বিশ্বাস

প্রদীপ মণ্ডল

বিশ্বাস ক্লান্ত ত্রস্ত বিধ্বস্ত বীতশ্রদ্ধ
মুখোশের বিভৎসতা দেখতে দেখতে।
সাগর গ্রাম শহর নদী পাহাড় শহরতলি
সর্বত্র মুখোশের বিভৎসতা মিশে মূল স্রোতে।

মানুষ খুঁজে ফেরে হৃদয় উজাড় করে,
পদে পদে বঞ্চনার শিকার স্বীকার ক'রে।
ছাড়ে না আশা পাবে নিশ্চয় প্রকৃত মানুষ
প্রতিটা মুখোশকে পৃথক ভাবে বিশ্বাস করে।

দুর্ভাগ্য, কোন না কোন ভাবে ঠিক হয় বঞ্চিত
হতোদ্যম নিরুপায় মুখোশের অমানুষিক জালে।
বিশ্বাস নিজের অজান্তেই ক্ষীণ দুর্বল অদৃশ্য
বড্ড অভিমানি হারালে জন্মায় না আর কোনো কালে।

মুখোশের কপটতায় জীবনে হারতে হারতে
বিশ্বাস একা আত্মপ্রত্যয়হীন এক চলৎ যন্ত্র।
ধীরে ধীরে জন্মেছে নতুন এক বিশ্বাস
মুখোশই বর্তমানে জীবনের মূল মন্ত্র।

লাল ইট

সুব্রত কুণ্ডু

শিরীষতলায় দেড়খানা মাটির ঘর
ভাঙা-ফুটো টিনের চাল
অল্প বাতাসেই কাড়া-নাকাড়া রোদের দংশন,
বৃষ্টির আলিঙ্গন, জ্যোৎস্নার চুম্বন।

শ্রমের ত্রয়ী নোনতা তরলের উজান ঠেলে—
উঠোনে জড়ো হয় লাল ইট স্বপ্নপুরণের লক্ষ্যে।

পাশে মন্দিরের চাতালে বসা
কতগুলো জড় জীবের মুখ দিয়ে ছোটে
হিংসের কালবোশেখি—
কদর্য সমালোচনার ঘুর্ণিপাক।

পূর্ণতা পায় স্বপ্ন-- তৈরি হয় স্বপ্নের-নীড়
রাতে মার্কিন জানলা দিয়ে
দখিন বাতাস এসে বুলিয়ে দেয় শীতল পরশ
সোনালি শিরীষ ফল বাতাসে দুলে
ঝুমঝুম শব্দে চোখে এনে দেয় প্রাশান্তির ঘুম।

আর মন্দিরের চাতালে তখন
থেমে গেছে কালবোশেখি, ঘুর্ণাবর্ত।

স্বপ্নের মানুষ

কৌশিক গাঙ্গুলি

অন্ধ নই, বধির নই,
নই রক্ষকের ভক্ষক হওয়ার উদাহরণ।
দুর্ভাগ্যের সৌজন্যে দিশাহারা তবু
ভালোবাসা পেতে আর দিতে এখনো ভালো লাগে,
প্রকৃত মানুষের সন্ধান পেতে তোলপাড় করি
কত মানুষের ভিড় ও মিছিল।
আদর্শহীন আর ধান্দাবাজদের জয়জয়কার দেখেও
বোকার মতন স্বপ্ন দেখি কিছু ভালোর।
অসভ্যতা, মিথ্যার গর্জন, দুষ্টের নির্মমতা আমাকে ব্যথিত করে,
চোখে আসে জল। একজন ব্যর্থ মানুষ এই সমাজে-
অর্থ, চাকচিক্যহীন একজন মানুষ
যে শুধু নিজস্ব আঙ্গিকে লিখে চলে সময়ের কবিতা-
রক্ত অক্ষরে, তাতে শুধু জীবন যন্ত্রণা।
হে দেশ, এই মোসাহেব আর ধূর্তদের ভিড়ে
আমি বড় বেমানান, তবু ভালোবেসে
হেরে যেতে যেতে খুঁজে পাবো স্বপ্নের মানুষ।

তুমি আসবে বলে

আব্দুল জলিল

তুমি আসবে বলে আজও আমি একা
তুমি আসবে বলে আজও পথ চেয়ে থাকা।
তুমি আসবে বলে আজও আমার আশা-প্রত্যাশা
তুমি আসবে বলে আজও আমার বেঁচে থাকা।

বসন্তের কোকিল সাড়া দেয় যখন,
আমার মনের কোণে রঙের ছোঁয়া পায় তখন।
শিমুল পলাশ যেন আবীরে রাঙা
তুমি আসবে বলে আছি অপেক্ষায়।

তুমি আসবে বলে আজও বসন্তের রঙ লাগেনি গায়ে।
তুমি আসবে বলে আজও চেয়ে দেখি চারি দিকে।
তুমি আসবে বলে আজও মনে রঙের ছোঁয়া ।
তুমি আসবে বলে আজও কুয়াশায় চাওয়া।

কখন এসে বসন্তের রঙ ছোঁয়াবে তুমি
দিনের পর দিন চলে যায়।
তুমি এখনো আসোনি।
তুমি আসবে বলে আমি আছি অপেক্ষায়।

হলে ভালো হতো

ত্রিদিবেশ দে

কিছু হওয়া খুবই শক্ত
তবে হলে ভালো হতো।
একটু ভাললাগা আসত।
সে দিন রাতে একদম চুপচাপ
ঝাপসা আলোয় দেখতে পায়নি;
কি যেন হঠাৎ মনে হল,
বিষণ্ন অন্ধকারে একা-
একাকীত্ব বোধ না থাকলে
পারতো না বসতে;
হয়তো অভাব বোধ
যেন মাথায় উসখুস করছে,
বন্ধু আছে কি ওর! কে জানে?
কখনও তো দেখতে পাইনি,
থাকলে ভালো হতো,
অস্বস্তি জাগিয়ে তুলছিল-
কোনো ব্যবস্থা করতে পারলে,
নেহাত খারাপ হতো না।
ভাবতে পারছে কই!
মনের মধ্যে জাগার ইচ্ছেটা
থাকলে ভাল হতো।

তাহলে হয়েই যাক!

গোবিন্দ মোদক

তখন থমথম করে উঠলো নৈঃশব্দের বাতাস
আর পাগড়ি পরা কিছু মুহূর্ত
হেঁটে গেল সামনে দিয়ে
ঝমঝম করে বাজলো স্মৃতির ঝাঁপি
টলমল করে উঠলো প্রত্যাশার পারদ।

তারপর কিছু সম্ভাবনাময় আলোচনা
শূন্য জুড়ে দু'হাতে আঁকলো কাঙ্ক্ষিত সাফল্য
আর গ্রীষ্মাবকাশ শেষ না হতেই
আকাশ মেলে ধরলো তার তুরুপের তাস।
এসো, কিছু রমণীয় মুহূর্ত পান করা যাক!

জীবন উদযাপন

মল্লিকা দাশ রায়

কারোর অসময়ে চলে যাওয়াটা কখনোই কাম্য নয়,
মেসেঞ্জার স্ট্যাটাসে সবুজ বাতির আলোয় থেকো সব সময়।

আসা-যাওয়া তো থাকবেই জীবনে চিরাচরিত এক নিয়ম,
তবুও যতোদিন থাকা তা উদযাপিত হোক আনন্দে পরম।

যে পাখি যায় সে আর ফেরে না এই কূলায় জানি,
তার জন্য ভারাক্রান্ত এ হৃদয়ে স্মৃতির মালারা মানি।

তাই বলে কি বন্ধু এভাবে বলতে হয় বিদায়!
বিদায় হোক সেটাই যা আবার ফিরিয়ে আনা যায়।

ভীষণ খুশিতে উদযাপিত হউক জীবনের প্রতিটি ক্ষণ,
বন্ধু সত্যি ভীষণ দামী তোমার আমার এই জীবন।

যখন

মৃত্যুঞ্জয় হালদার

যখন জোয়ার আসে
ডুবে যায় সব,
সহসা সোহাগ ভাসে
করে কলরব।

কত ভাব ভালোবাসা
মনে আসে ছুটে,
কতো আশা ভালো ভাষা
মরে মাথা কুটে।

এ কূল ও কূল হারা
নীড়হারা পাখি,
আলাপে আমোদ যত
সুখে নেয় মাখি।

তারপর সব শেষ
উৎসাহ যত,
বিষাদ ও বিদ্রুপ
করে বেশ ক্ষত।

প্রতীক্ষায় থাকা সেই
দিনকাল ঘুচে,
কবে কামনারা দেয়
কালঘাম মুছে।

মুক্তি

মোহিত ব্যাপারী

বিশ্বাস তোমার কাছে মূল্যহীন।
প্রতিশ্রুতি ! সে তো কতজনই কতজনকে দেয়।
প্রতিশ্রুতি আর বিশ্বাস যদি দায়ভার...
ঝেড়ে ফেলো তাকে।
ভালোবাসা যদি শৃঙ্খল হয়
খাঁচা ভেঙে উড়ে যেও দূ-উ-উ-উ-র
দূ-উ-উ-উ-র আকাশের ওপারে।
তুমি স্বাবলম্বী আত্মনির্ভরশীল।
মুক্তির স্বাদ নিয়ো মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে।
আমার কাঁটাতারের ওপারে।

অনন্যজয়ী

সুতপা ব্যানার্জী (রায়)

প্রতিভার পরম্পরা নিয়ে জন্ম এক বিস্ময় বালকের,
যে নিজের শর্তে বাঁচতে চায়,নিজের শর্তে ভাবতে চায়,
ভালো লাগার গভীরতা অতলান্ত, জ্ঞানও সীমাহীন,
বালক মনে যার অবাধ যাতায়াত, কুঁড়ি ফোটান,
চিত্রকরের কুশীলবেরা বুঝতেই পারে না পার হওয়া,
ব্যতিক্রমী পছন্দেরা সেই পরশপাথরে প্রাণ পায়,
গ্রাম বাংলার জীবন পাঁচালির সঙ্গে মিশে যায় পৃথিবী,
অবাক বিস্ময়ে দেখে সাদা কালোয় মণিমুক্ত ঝরা,
রহস্য ভেদেও বিদ্ধ হয় সভ্যতার সংকট,বুজরুকি,
বেকারত্বের দহনজ্বালায় দর্শকের চোখ ভেজে,
কিন্তু অতিনাটকীয়তার প্রলেপ নেই,জীবন্ত ক্যানভাস,
চরিত্ররা তাঁর আজন্ম বিশ্বাস,শিক্ষার কথা বলে,
চিনতে পারা যায় চারপাশের সেলুলয়েডিয় প্রতিবাদ,
মনোজগৎ সুশিক্ষিত করে রাঙামাটির দিকপালেরা,
বিশ্বকবির বড় কাছের সুকুমার পুত্রের গড়ে ওঠা,
পাশ্চাত্য তাকে ভাসায় নি, প্রাচ্যের কাছে এনেছে,
সাঙ্গিতিক জ্ঞান এক অনন্য সিগনেচার হয়ে আছে,
তাঁর অননুকরণীয় চলা বলায় তিনি এক আশ্চর্য দীপ,
যা জ্বললে না দেখে এড়িয়ে যাওয়া বড় মুশকিল,
সময়ের তফাতে যা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর।

সময়ের প্রমিথিউস

নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

আরও অনেক পথ হাটতে হবে অন্ধকারে-
আসল আলোর দিগন্ত অনেক কালোর পর-
অনেক স্নায়ুভাঙা ঘাম-রক্তের বিনিময়ে।

অন্ধকারেই নগ্নতা নিরাপদ- অন্ধকারে অন্ধকারই মুখোশ-

দেশলাই কাঠি আছে সব মনেই- সব কাঠি
একটি খাপে পুড়ে দেওয়ার মিস্ত্রি কোথায়?
কাঠিগুলো নিজেরাই একখাপে ঢুকে গেলেই কিন্তু নতুন লিজেন্ড-

ককেশাসের আগ্নেয় শৃঙ্গ থেকে হিংস্র ঈগলের ঠোঁটে ছাই ঠেলে
নিমিয়ার সিংহের ছাল পরা তপ্ত হেরাক্লিসের কাঁধে
ঠিকই নেমে আসবে সময়ের প্রমিথিউস দেশলাই খাপে।

একটি অসমীয়া কবিতাঃ

ভাবিছোঁ

নবযানী বৰুৱা শইকীয়া (ডিগবৈ)

ভাবিছোঁ
এখন জেইল সাজিম ।
হাঁহিমুখীয়া উজ্বল চকুৰ ডেকাবোৰক
বন্দী কৰি ৰাখিম ।
ঔ ফুলিয়া হাঁহিৰ মাজত
জক্ষি পানেই গীত শুনিম ।
ভাবিছোঁ এখন জেইল সাজিম ॥

ভাবিছোঁ
নগৰত এখন বজাৰ খুলিম ।
চিঙ্গল বুলি ষ্টেছাচ ৰখা ডেকা বোৰক
তাতে নিলাম কৰিম,
গাভৰু বিনামূলীয়া নহ'ব
মূল্য মৰমত নিৰ্ধাৰণ কৰিম ।
ভাবিছোঁ এখন বজাৰ খুলিম ॥

ভাবিছোঁ ,
এখন স্মৃতি গ্ৰন্থ লিখিম ।
প্ৰথম পৃষ্ঠাত মিছলিয়া ডেকাসকল
দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত মিছলিয়া ডেকা সকল
আৰু তৃতীয় পৃষ্ঠাতো মিছলিয়া ডেকাসকলৰ নাম
ফটোসহ প্ৰকাশ কৰিম ।
যিয়ে ইতিমধ্যেই বহু প্ৰেমিকৰ হৃদয় চুৰ কৰি
আত্মগোপন কৰি আছে
শেষৰ পৃষ্ঠাত তেওঁলোকক সম্মানিত কৰিম ।
ভাবিছোঁ এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ লিখিম ॥

ভাবিছোঁ
এটা ভাল সপোন দেখিম ।
সপোনৰ উৎস ফেচবুক কৰিম
বচা বচা সপোনখিনি আঁকি বাকি যুগমীয়া কৰিম
বাচনীত নুঠাখিনি
দুস্বপ্ন কৰি ব্লক লিষ্টৰ অতিথি কৰিম ।
ভাবিছোঁ এটা সপোন দেখিম ॥

ভবাখিনি সহজ বাবেই ভাবি পেলালোঁ
কোৱা খিনি সহজ বাবেই কৈ পেলালোঁ
কৰা খিনি যে সহজ নহয় !
সেয়ে ভৱিষ্যত ভাবি চাম বুলিয়েই হাত সাৰিলোঁ
ভাবিছোঁ কেতিয়াও আৰু একো **নাভাবোঁ** ।

ছড়ায় ছন্দে

তবু ভুলব না

পশুপতি দত্ত

নাম না জানা কোন এক পাখি
আমায় ডাকে মিছি মিছি,
সে তো গাছের ডালে বসে
কাটায় সময় আনন্দ উচ্ছ্বাসে।

আমি ভুলব না তার ডাকে
সে তো আলতা চোখে মাখে,
তার মনভোলানো চাওয়া
আমার আবির জলে নাওয়া।

তবু লাগেনা দেহে রঙ -
দুঃখ ভোলার ছলে সাজি শুধু সঙ,
হঠাৎ দেখি ঘাপটি মেরে বেড়ার ধারে বসে-
শিকার ধরার কৌশলটা তার যে বারোমেসে।

সুখ সাগরে ভেসে ও তো চলে দুলে দুলে
আমার না হয় জুটেছে কাঁটা তবু ভুলব না তার ছলে।

জীবনের হিসাব

বিকাশ চক্রবর্তী (সিউড়ি)

জীবন খাতার পাতাগুলো
উল্টে দিয়ে দেখি-
যোগ বিয়োগের অনেক ত্রুটি
বেরিয়ে আসে একি?
চলতে পথে ভুল হয়েছে
মাশুল হবে দিতে-
কান্না হাসি, সুখ-দুঃখ
তাইতো হবে পেতে।
সাদা পাতার মূল্যই নেই
দেখতে শুধু ভালো,
অন্ধকারেই পেতে পারো
যতেক মূল্য আলো।
মন্দ-ভালো নিয়েই জীবন
টানা-পোড়েন চলে,
তারই হিসাব জীবন খাতায়
জমছে দলে দলে।
হিসাব যখন শূন্য হবে
যোগ ও বিয়োগ নাই-
শেষটা হবে চলার পথের
সন্দেহ কি তাই?

ভূত

অঞ্জলি দে নন্দী (মম)

বলছি শোন! পারলে দেখিস তারে!
ভূতের চোখে নাই তো ঘুম-
তাল গাছে উঠে, তাল ফেলে পুকুর পাড়ে
দুম দাম দুম দুম দুম-
তখন রাত নিঝুম।
তারপরে গাছ থেকে ঝাঁপ দেয় পুকুরজলে।
হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটে,
রাত পেরিয়ে সকাল হলে
সূর্যি যখন আলো ঢালে পুকুর ঘাটে,
ভূত তখন লুকিয়ে পরে পুকুরের গভীর তলে।
ছোট্ট মেয়ে নাইতে যায় যেই না ঘাটে,
যেই না সে হেসে হেসে সাঁতার কাটে
ওমনি ভূত জলের গভীর তল থেকে উঠে আসে।
মেয়ের কানের কাছে এসে বেদম হাসে।
ঘন ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে,
নাকি সুরে বলে, লাল লাল দু-চোখ মেলে,
হাঃ হাঃ হাঃ- হিঃ হিঃ হিঃ- হাঃ হাঃ হাঃ!
বাঁলিকাঁর গন্ধ পাঁই।
তোকেঁই গিলতেঁ চাঁই।
কঁচি মেয়ে চিঁবিয়ে খাঁই।
হিঁচরে টানি ছোঁট্ট দুপাঁই।
পাঁলাবার জোঁ টি নাই।
হাঃ হাঃ হাঃ- হিঃ হিঃ হিঃ- হাঃ হাঃ হাঃ!

দ্রব্যমূল্য

অনন্য রাশেদ

দ্রব্যমূল্যে আসছে জোয়ার
ভাটা পড়ছে ঘরে ঘরে ।
গরীব দুঃখীর আহাজারি
মধ্যবিত্ত লজ্জায় মরে !

বাজার যেন আগুন গোলা
অর্ধ পকেট সইবে না তাপ ।
এমন বাজার বইতে পারে
রাজা, ধনী যার আছে দাপ ।

উপায় খুঁজেই যাচ্ছে সময়
দাম কমানোর ব্যাস্ত ধান্দায় ।
মিলছেনা মূল্য কোনো কিছুর
যাচ্ছে সময় চিন্তায় পান্তায় !

ব্য ক্তি গ ত প্র ব ন্ধ

বর্ষাকাব্য

শ্বেতা ভট্টাচার্য্য

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস নয়। শ্রাবণের পয়লা আজ। প্রথম কদম ঝরে গেছে অনেক অনেক দিন। বর্ষা আবার ডালি সাজিয়েছে নতুন ফুলে-ফলে। বাতাসে ভাসছে তাদের মৃদু সুবাস। বুকের ভেতরে কোড়া পাখি আর ডাহুকগুলো চঞ্চল হয়ে উঠছে থেকে থেকে। তাদের এলোমেলো ডানার ঝাপট আর করুণ কণ্ঠের আহ্বানে গলার ভেতর কী একটা দলা পাকিয়ে উঠছে বারবার। বিরহী যক্ষ আমি, নির্বাসিত আজ বহু বহু দিন। অজানা এক অসুখের প্রাদুর্ভাবে বাঁচিয়ে চলেছি পরস্পরের ছোঁয়াচ। সব্বাই বাস করছি এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। আমার বিরহখিন্না প্রেয়সী রয়েছে অলকাপুরীতে।

আমার বিরহী হৃদয় থেকে থেকে বিদীর্ণ হচ্ছে প্রিয়ার অদর্শনে। মেঘের অন্বেষণে সজল দৃষ্টি প্রসারিত করে আছি আকাশ পানে। রক্তাক্ত হৃদয়ে মেঘদূতকে সকাতরে আহ্বান করে চলেছি-

- বর্ষার মেঘ যাও না, এনে দাও না আমার বিরহবিধুর প্রেয়সীর বিহ্বল হৃদয়ের সন্দেশ। নিদ্রাহীনার নিশিযাপনের চিত্র তুলে ধর তোমার অপূর্ব বর্ণনায়। যাও না মেঘদূত। আমার প্রিয়ার অদর্শনে আমি যে বড়োই কাতর...।

মেঘদূত বড়ো অভিমানী হয়েছে আজকাল। অবাধ্যও বটে। বয়স বেড়েছে যে! কোনো বার্তাই সঠিকভাবে পরিবেশন করতে পারে না। সঠিকভাবে শোনে কি না তাই বা কে জানে? বেতারতরঙ্গে সংবাদ দেয়া-নেয়া তার না-পসন্দ। অথচ নিজেরও মতিগতির ঠিক নেই। উত্তরে যেতে যেতে বাঁক নিয়ে নেয় পুবে। কিংবা মাঝপথে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটির বুকে। কখনও বা মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে উড়ে যায় কোন সুদূরে। মেঘদূতের ভরসা কী! অগত্যা বেতারতরঙ্গ বা সামাজিক মাধ্যমই ভরসা। তাতেই বা মন ভরে কই?

আগে তো অলকাপুরীতে প্রায়ই চলে যেতাম, যখনই ইচ্ছে হোতো। এখন যে আমি অভিশপ্ত, এখন যে আমি নির্বাসিত! রামগিরিতে (পড়ুন জলপাইগুড়ি) বন্দী বিরহী যক্ষ আমি, আমার পারাবত প্রিয়া সুদূর অলকাপুরীতে। এই ব্যবধান অসহনীয় হয়ে উঠেছে আমার কাছে। আমার প্রিয়াও না জানি কতই কাতর তার যক্ষের বিরহে! আমি যাবই...সব নিষেধ বাধা অমান্য করে...যেতেই হবে আমাকে ...বিরহ যার ভালো লাগে লাগুক...আমার তো অন্তত নয়...!

গত কয়েকদিন প্রবল ধারায় ঝরে গত সন্ধ্যায় আকাশ ক্ষান্ত হয়েছে। পুব আকাশে মেঘের কোলে চলেছে নবজাত সূর্যের দেয়ালা। কিন্তু আমার মনশ্চক্ষে ভাসছে বেশ কিছুদিন আগে দেখা আমার প্রেয়সীর অনিন্দ্য সুন্দর হাসি। রামগিরির ভোরের সূর্য আমায় টানছে না মোটেও। আমার দৃষ্টি পড়ে আছে অলকাপুরীতে।

বাধানিষেধ উপেক্ষা করে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়েছি আজ। মনে প্রবল উত্তেজনা,সঙ্গে আবার এক ফুরফুরে ভাব। ভোরের আকাশে-বাতাসে-আলোয় কী অপূর্ব স্নিগ্ধতা। বাতাসের জোলো ভাবটা কী ভালোই যে লাগছে! সাদায়-কালোয় বালাসন নামটা চোখে ভেসে উঠতেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলাম আমি। পথে রোহিণীর সাথে দেখা। কুশল-সংবাদ বিনিময়ের পর জানতে চাইলাম তার কথা। রোহিণীর ভুবনমোহিনী হাসি আমায় আশ্বস্ত করল। সবুজের সমারোহ রোহিণীর শ্যামাঙ্গ জুড়ে...।

ভরা শ্রাবণে সবুজ রঙের ঘাঘরা ছড়িয়ে সে বুঝি বসে ছিল আমারই প্রতীক্ষায়। ধানী রঙ ঘাঘরি আর মেঘরঙ ওড়নায়...সে এক অপরূপ ভঙ্গিমায়! গ্রীষ্ম-শীত-বসন্তে তার অপরূপ সৌন্দর্য তো অবলোকন করেছি কত কতবার। কিন্তু বর্ষার মোহময়ী রূপ, এই প্রথম! সদ্যস্নাত কেশপাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়ছে সর্বাঙ্গে। বিন্দু বিন্দু জলে ভিজে যাচ্ছে সর্বশরীর। প্রকট হয়ে উঠেছে তার ভরন্ত যৌবন। দেহের খাঁজে খাঁজে অপূর্ব লাবণ্য আর রহস্যময়তা। পাকদণ্ডী বেয়ে বেয়ে বিপদের হাতছানি। তবু এড়িয়ে যাওয়ার পথ তো নেই। বিপদ জেনেই তো ঝাঁপ দিয়েছি...ঝাঁপ যখন দিয়েছি তখন শেষ না দেখে তো যাব না।

ধূসর পাথরের বরণডালায় সাজানো ছিল ফুল, ফল, পাতা, ধূপ আর দীপ। আর ছিল যৌবনবতী ঝর্ণার স্ফটিকস্বচ্ছ জল...সে-ও পাথরের আধারে। ধূপের ধোঁয়ায় ঘন আঁধারে ছেয়ে গেছিল তার মুখ। ধোঁয়ায় না কি অদর্শনে কিংবা হয় তো আনন্দে... ঝরোঝরো ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগলো তার দুচোখ বেয়ে। পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকে অশ্রুবারিতে স্নাত হ'লাম আমি। পরমুহূর্তেই আনন্দে ঝরঝর করে হেসে ফেললো সে। হালকা কমলা আভায় ছেয়ে গেল চারিদিক। আমি চেয়ে চেয়ে উপভোগ করতে লাগলাম এই কান্না-হাসির খেলা। পাশাপাশি চলতে শুরু করলাম দুজনে। কত সুঘ্রাণ ভেসে আসতে লাগলো তার যৌবনসিক্ত

তনু থেকে। কখনও সোঁদামাটির, কখনও বুনোফুলের, কখনও বা গাছ-গাছালির, আবার কখনও ধূপ বা কুয়াশার।
কথা বলে চলেছে সে অবিশ্রান্ত, আমি কান পেতে শুনছি। তার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছে...কখনও পাখির কূজন, কখনও ঝিল্লীর ঝঙ্কার, কখনও বা বয়ে যাওয়া ঝর্ণার কলকল আওয়াজ। গলার স্বর খেলা করে চলেছে বিভিন্ন সপ্তকে...কখনও মন্দ্র, কখনও মধ্য, কখনও বা তার সপ্তকে। রূপসীর আবেগমথিত হৃদয় হেসে উঠেই পর মুহূর্তে কেঁদে ফেলছে ঝরঝর করে। আমার দুচোখও জলে সিক্ত হয়ে উঠছে বারবার। চলতে চলতে ঝাপসা লাগছে চারধার। নিজেকে সামলে নিয়ে চলেছি তার হাতে হাত রেখে। ঠাণ্ডা-শীতল হাতের পরশে কেঁপে কেঁপে উঠছে আমার দেহ। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি সেই শীতল পরশ।

আমাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, কেউ নেই, কিচ্ছু নেই, শুধু আমরা আছি। ঘোর-লাগা চোখ, আবেগমথিত দুটি হৃদয় আর শুধু হাত ধরে থাকা কাছাকাছি। মন বলে চলেছে এমনি করেই যেন চলতে পারি, না বলেও বলতে পারি- ভালোবাসি, ভালো আছি। ভালোবাসা মানুষকে অসীম উচ্চতায় তুলে দেয়। যেখানে পৌঁছে গেলে ক্ষমা করা যায় সবাইকে। মন ভরে যায় এক অতীন্দ্রিয় সুখে। ওই বিশাল উচ্চতা থেকে ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ - সব রকম তমোগুণ বড়ো ক্ষুদ্র দেখায়। আলিঙ্গনে আবদ্ধ করা যায় শত্রুকে। ভুলে থাকা যায় সব তিক্ততা, বিষাদ, অবসাদ, হতাশাকে। ভুলে রইলাম সমস্তটা দিন সবকিছু, শুধু চেতনা জুড়ে রইল তার সান্নিধ্য।

সন্ধে হয়ে এল। এবার ফেরার পালা। মন বিষাদে ভরে গেল। তার হাতে আমার হাত, বড়ো কঠিন বাঁধনে বাঁধা। চোখ ছলছল করছে, মাথা নীচু করে নিলাম। আলতো করে ছাড়িয়ে নিলাম হাত। পেছন ফিরতেই কাতর স্বরে বলে উঠল,

- আবার কবে আসবে?
- খুব শিগগিরি...।

কুয়াশা ঘনাচ্ছে একটু একটু করে। ঝাপসা হয়ে এল আমার চোখ। টলতে টলতে ফিরে চললাম। বারবার পেছন ফিরে চাইছি। সবুজ ঘাঘরায় আঁধার নেমেছে। কুয়াশা ঢাকা এক অবয়ব...দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রস্তরবৎ। জানি জল ঝরছে তার দু'চোখ বেয়ে। যেমন ঝরছে আমার...

"...बारिश की बूंदें चुपके से कह रही है...
कितना भी ऊँचा उठ जाओ तुम...
पर आना तो तुम्हें जमीन पर ही है..."

জলবিন্দু মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে যতই ওপরে উঠুক না কেন, তাকে আবার নিচেই নেমে আসতে হয়।

ছো টো গ ল্প

সন্তপ্ত

মৃন্ময় ভৌমিক

বিয়েটা টিকলো না তমালের। শেষমেশ ছাড়াছাড়ি হয়েই গেল। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। কারণটা কি কেন আজও যানা যায়নি। এখন তমাল নীলাঞ্জনা দু'জনে আলাদা আলাদা থাকে। দু-জনের দূরত্ব দশ কিলোমিটার। তাদের দুজনের এক সন্তানও আছে- শুভম, ষষ্ট শ্রেনিতে পড়ে। খুব একটা চালাক চতুর নয়। কেমন যেন আনমনা।

শুভমের যখন আট বছর বয়স, তাকে ছেড়ে নীলাঞ্জনা ঘর ছাড়ে, হঠাৎই; কোন মায়া মমতা, কোন পিছুটান দমিয়ে রাখতে পারেনি।

তমাল কোলকাতায় বিঞ্জাপন সংস্থায় কাজ করে। সাংসারিক সচ্ছলতা ততটা নয়। সোজা কথায় চলে যায়। ঘরে আছে মা, বেকার দাদা। তমালের আয়ে সংসার চলে। তাতেই চলে যাচ্ছিল। অসুখ একটাই- মাঝে মধ্যে শোনা যেত শাশুড়ি বৌ এর ঝগড়া, এপাড়ার অল্পবিস্তর সবাই জানে।

তমাল দুজনের কাউকে কিছু বলতে পারতোনা। এমনিতেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজের জন্য বাইরে থাকতে হতো। ঘরে ঢুকলে মা বৌ এর রাশিরাশি অভিযোগ। তমাল খেই হারিয়ে ফেলতো। কাকে বোঝাবে ও। এই কারণে কাজ থেকে এসেও বেশীক্ষন ঘরে থাকতে পারতো না। চা বিস্কুট খেয়ে বেড়িয়ে পড়ত। পাড়ার চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিত। যতক্ষন শান্তিতে কাটানো যায়, এই আর কি!

তমাল নিরুপায়। বুঝতে পারে না এর নিরসন কোথায়। তবে বেশ বুঝতে পারে সংসারটা ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাচ্ছে। কোন বাঁধে মেরামতি সম্ভব বুঝতে পারে না। মাকে বল্লে মা রাগ করে, বৌকে বললে বৌ বলে, "মায়ের কথায় যদি চলবে তাহলে আমাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন? আমাদের তো দেখাশোনার বিয়ে নয়। তখনই চিন্তা করা উচিত ছিল সামাল দিতে পারবে কিনা"।

তমাল বলতে পারেনা বিয়ের আগে তোমারও বোঝা দরকার ছিল, "তুমি মানিয়ে চলতে পারবে কিনা। এক আধবার নয়, বহুবার আমার বাড়ি এসেছো"। তাহলে তুমুল ঝড় বইতো। চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করে।

বহুবার চরম অশান্তি ঘটে যাবার পর যখন দুজনের প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ তখনই ডাক পডতো বুম্বার। বুম্বা তমালের স্কুল জীবনের বন্ধু। লেখা পড়া একই সঙ্গে। পুলিশে চাকরি করে। সেই কারণে

এলাকায় দাপট আছে; অনেকেই একটু সমীহ করে। প্রায় যাতায়াত করার জন্য পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শুভমও বুম্বাকে খুব ভালোবাসতো। প্রায়ই এখানে ওখানে ঘুরতে যেত।

বুম্বার এক মেয়ে সায়নী। মা মরা মেয়ে। সায়নীর যখন দশ বছর বয়স তখন ওর মা ব্লাড ক্যান্সারে মারা যায়। তখন থেকেই ঠাকুমার কাছে মানুষ। আজ সে ক্লাস সেভেনে পড়ে। তমালদের বাড়ি প্রায় ঘুরতে আসে। কিন্তু শুভমের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ওঠেনি। নীলাঞ্জনা কিন্তু সায়নীকে খুব ভালোবাসে। নিজের ছেলেকে যতোনা কাছে টানে তারচেয়ে একটু বেশি টানে সায়নীকে।

শাশুড়ি মনোরমা দেবী কোনদিনই ভালো মনে মেনে নেয়নি। উঠতে বসতে কম গঞ্জনা শুনতে হয় না নীলাঞ্জনাকে। কিন্তু তমালকে এ বিষয়ে কিছুই বলেনা। অথচ বুম্বাতো তমালেরই বন্ধু। তার সূত্রেই নীলাঞ্জনার সঙ্গে তার পরিচয়। তাতে শাশুড়ির মুখ থামেনা। পান থেকে চুন খসলেই শুনতে হয়, "এত মাখামাখি,ঢলাঢলি কিসের"? নীলাঞ্জনার সহ্য হয়না। ঘরের দরজা দিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলে। মাঝে মাঝে মনে হয় এ জীবন আর রাখবে না। জীবনের প্রতি চরম ঘৃণা জন্মে গেছে।

তমাল বোঝে, কিন্তু মা, বেকার দাদাকে ছেড়ে কোথায় যাবে। কি করবে বুঝে উঠতে পারেনা। শ্যাম রাখলে কুল যায়, কুল ধরলে শ্যাম বিরাগ হয়। তার ওপর ছেলেটাও পরিপূর্ণ স্বাভাবিক নয়। বুদ্ধির যথেষ্ট খামতি। এই সাত পাঁচ সমস্যায় জর্জরিত তমাল পেন্ডুলামের মত দোলে।

সেদিন তমাল কাজে বেরিয়ে যাবার পর খুচখাচ অশান্তি শুরু হলো। নীলাঞ্জনার অপরাধ আজ একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছে। তখনও সকালের প্রাত্যহিক কাজ হয়নি। মুখে ব্রাশ ধরাই আছে। ঘরের ভেতর থেকে শাশুড়ির গলা শুনতে পায়, "ঘরের বৌ, না গতর খাকি। বেলা বয়ে যায়, ঘুমই ভাঙেনা। আমার ছেলেটা না খেয়ে কাজে বেরুলো,আর মা-বেটা এতক্ষনে ঘুম থেকে উঠলেন। বলি চা-জল, দুপুরের রান্না কি তোর বাপে এসে করবে"?

রাতে তমালের সঙ্গে অশান্তির জন্য ঘুমাতে দেরি হয়েছে। তাই উঠতে দেরি। নীলাঞ্জনা কোন উত্তর দেয় না। আপন মনে ব্রাশ করতে থাকে। শাশুড়ির মুখ চলতে থাকে,"বলি, কথা কি কানে ঢুকছেনা রাজার বেটির। এরকম চললে তো এ ঘরে থাকা যাবেনা। অন্য ঘর খুঁজে নিতে হবে। বেলেল্লাপনা চলবে না। ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাও।

নীলাঞ্জনা আর চুপ থাকতে পারলো না। তীব্র প্রতিবাদ উঠলো,"এই কথাগুলো আমায় না বলে আপনার ছেলেকে বলবেন। কি বেলেল্লাপনা করেছি? মুখে যা আসবে বলবেন? আমি কিন্তু সহ্য করবো না। আর কি বলছেন? ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব, ছেলে কি আমি বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি? গেলে আমি একাই যাব। কাউকে পরামর্শ দিতে হবে না। অনেক সহ্য করেছি আর নয়"।

"আসুক আজ তমাল, এর বিহিত করতে হবে। হয় তুমি থাকবে, না হয় আমি"। শাশুড়ি গটগট করে রান্না ঘরে ঢুকে গেল। ঝনঝন করে বাসন পড়ার শব্দ।

নীলাঞ্জনা ঘরের দরজা দিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলে। আকাশ পাতাল ভাবে। কূল পায়না। মনে মনে ঠিক করে ফেলে এর হেস্তনেস্ত করতে হবে। আজ তমাল আসুক। সারাদিন অভুক্ত থেকে যায়।

ছেলেও না খেয়ে স্কুলে চলে যায়। রোজ রোজ এই অশান্তি তারও ভালো লাগে না। ক্রমশঃ বেবাক হয়ে যায়। তার মনে কি প্রতিক্রিয়া করে, কেউ ভাবে না। সব সময় নিজের মধ্যে নিমগ্ন থাকে। বাবা মায়ের সঙ্গে মন খুলে কথা বলে না।

সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে তমাল সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। মাকে জিজ্ঞেস করে নীলাঞ্জনা কোথায়?

মা বলে,"তমাল আজ তোকে ঠিক করতে হবে কি করবি তুই। এই বৌ নিয়ে আমি ঘর করতে পারবোনা। তুই চিন্তা করে যাহোক বিহিত কর। নাহলে ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েদে। দুষ্টু গরুর চেয়ে শুন্য গোয়াল ভালো।

তমাল নীলাঞ্জনাকে ডাকে। সেখানে মা, দাদা, ছেলে সবাই উপস্থিত। "কি হয়েছে নীলা"? নীলাঞ্জনা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মনোরমা দেবী ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "এখন কথা সরছে না। চুপ করে থাকলে সমাধান হবে? বেহায়া মেয়েছেলে কোথাকার। সারাদিন মোবাইলে কার সঙ্গে গল্প কর? বুম্বা তোমার কোন নাগর "।

নীলাঞ্জনা আর চুপ থাকতে পারলো না। তমালকে বলল, "শুনছো তোমার মায়ের মুখের ভাষা! এরপর তুমি আমাকে মানিয়ে নিতে বলবে? যে আমার সঙ্গে গরু ছাগলের মতো ব্যবহার করে। বুম্বার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক, আমার সঙ্গে কি? আমি তাকে বাঁচাতে যাইনা। তোমাদের দুজনার মধ্যে পড়ে আমার জীবন নরক হয়ে গেছে। কোন সুখে আছি। আমার সাংসারিক, দৈহিক জীবন ছারখার হয়ে গেছে। এতো নির্লিপ্ত পুরুষ দেখিনি। যেন জড় পদার্থ। দিনান্তে দুমুঠো ভাতের জন্য সংসার। এই সংসার আমি চাইনি। আমাকে মুক্তি দাও। তুমি থাকো তোমার মা,ভাই নিয়ে। আমি চলে যাব। থাকতে চাইনা বদ্ধ জীবনে। হাঁপিয়ে উঠেছি "।

তমাল বারবার চুপ করাবার চেষ্টা করে। নীলাঞ্জনা চুপ করে না। বলতেই থাকে। এতদিনের জমে থাকা দুঃখ, যন্ত্রনা, ক্ষোভ, লাঞ্ছনা ভিসুভিয়াসের মত উদ্গিরণ হতে থাকে। থামানো যায় না। বলতে বলতে ছুটে ঘরে ঢুকে যায়। দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়।

সকালে উঠে তমাল কাজে বেরোবার প্রস্তুতি নেয়, চা নিয়ে চেয়ারে বসে। মা এসে বলে, "দেখ, রাজরানীর এখনও ওঠার সময় হয়নি। তুইতো কাজে বেরোবি। তুই ভাবিস আমি মিথ্যে বলি"।

তমাল উঠে গিয়ে দরজায় টোকা দিয়ে ডাকে, "নীলা"…। কোনো আওয়াজ পায়না। দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে যায়। ভেতরে ঢুকে দেখে নীলা নেই। তমাল আঁৎকে ওঠে। "মা নীলাতো ঘরে নেই। কোথায় গেল"?

মা বলে, "দেখ সকাল সকাল কোন নাগরের সঙ্গে বেরিয়েছে। আমি কি এমনি এমনি বলি "।

তমাল এ-ঘর সে-ঘর দেখে; না ঘরে নেই। পাড়ায় বেড়িয়ে আশেপাশের বাড়িতে খোঁজ নেয়। না কোথাও খোঁজ পায়না। ছুটে যায় বুম্বার বাড়ি। ডাকে বুম্বা বুম্বা। দরজা খুলে বেরিয়ে আসে বুম্বার বাবা অখিলেশ বাবু- "কি হয়েছে তমাল, কোনো সমস্যা? আজ কাজে বেরোওনি "?

- না কাকাবাবু। বুম্বা কোথায় কাকাবাবু?

- বুম্বাতো নেই, ওতো ভোর বেলায় বেড়িয়ে গেছে।

তমালের অজানা আতঙ্কে বুকটা কেঁপে ওঠে। তবে কি মায়ের কথাই সত্যি। নীলাঞ্জনা কি সত্যিই বুম্বার সঙ্গে...; আর ভাবতে পারেনা তমাল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "না,মানে কবে ফিরবে"?

-বলেছেতো আগামী কাল ফিরবে।

-কেনো গেছে, কোথায় গেছে, সঙ্গে আর কে আছে জানেন কাকাবাবু?

-বললো, অফিসের কাজে যাচ্ছি। আর তো কিছু বলেনি।

-ও ফিরলে আমার বাড়ি যেতে বলবেন, খুব দরকার।

তমাল বাড়ি ফিরে মাকে সব কথা বলে। মা বলে, "বারবার সাবধান করছিলাম, শুনিসনি আমার কথা। এ ঐ বুম্বার কাজ। তোর বউকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে "।

দু-দিন পর বুম্বা তমালের বাড়ি এল। এই দু-দিনেও নীলাঞ্জনার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

-কিরে তমাল তুই আমার খোঁজে গিয়েছিলি? কি হয়েছে?

-তুই কি নীলার খবর জানিস?

-কেন, কি হয়েছে নীলাঞ্জনার।

-আজ দু-দিন নীলার কোনো খোঁজ নেই।

-তার জন্য আমার খোঁজ করছিস কেন? তোর বৌ কোথায় গেল খুঁজে বের কর। তোদের বহুবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি; না তুই বুঝলি, না তোর মা। ঘরের বৌ এর সঙ্গে এরকম ব্যবহার কেউ করে। তোরা সামলাতে পারলিনা। তার জন্য আমার বাড়ি কেন গেলি বুঝলাম না।

-না, মানে, বুম্বা আমাদের সঙ্গে, মানে নীলার সঙ্গে তোর সদ্ভাব আছে। যদি তুই খোঁজ দিতে পারিস। সেই উদ্দেশ্যে যাওয়া।

-বলি তমাল, তুই কেমন ধরনের পুরুষ নিজের বৌকে সামলাতে পারিস না, বন্ধুত্বকে সন্দেহ করিস। ধিক তোকে, ধিক। ভুলেও আমার বাড়ি যাসনা। বাড়িতে আমার বয়স্ক মা-বাবা আর আমার ১৫ বছরের মেয়ে সায়নী। ওদের কাছে আমাকে বেইজ্জত করিস না। তুই আর আমার বাড়ি আসিস না। আমি বারণ করে গেলাম।

-তমাল ধপাস করে মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে। চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসে।

এরপর দু-বছর কেটে গেছে, তমাল নীলাঞ্জনার খোঁজ পায়নি। বহু জায়গায় গেছে। খড়কুটোর মধ্যে সুঁচ খোঁজার মতো খুঁজে গেছে। হদিস করতে পারেনি। আজ তমাল বড় একা। শুভম যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা।

একখণ্ড জলবতী মেঘ ও একটি অতৃপ্ত আত্মা

আসিফ আলতাফ

বাতাসের ঢেউয়ে ভেসে আসছে মোহের মতো তীব্র ঘ্রাণ। সে ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি। কীসের ঘ্রাণ এটি? নিশ্চয়ই কোনো ফুলের। কিন্তু কোন ফুল? মনে পড়ছে না তো। তবে মনে হচ্ছে এ ঘ্রাণ তার চেনা, এবং এ ঘ্রাণের ভিতর একটি সম্মোহনী শক্তি আছে। কী ফুল এটি? কী ফুল? কী ফুল? ভেবে দিশেহারা হয় মুশফিক। আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর রাজত্ব। আজ যেন চাঁদের অভিষেক। জোছনায় ঝলমল করছে চরিদিক। পৃথিবী যেন এক বিয়ের কনে। বিউটি পার্লারে গিয়ে যেন সে সেজে এসেছে। অপরূপ লাগছে আজ তাকে। চিরচেনা প্রকৃতি আজ অচেনা লাগছে মুশফিকের কাছে। তার ঘরের সামনের নারকেল গাছটির উপর চাঁদের আলো ঠিকরে পড়েছে। গাছটিকে আজ একটি অলৌকিক বৃক্ষ বলে মনে হচ্ছে মুশফিকের।

.

রাত কটা হবে? ৯টা? মুশফিক হাত ঘড়ির দিকে তাকায়। ঘড়ি যেন তার সাথে কথা বলে ওঠে- কী হলো মুশফিক? সময় জানতে চাও? ওই একটি কাজের জন্যই তো আমার কদর। তাও সব সময় নয়। শোনো, এখন বাজে রাত ১০টা। শহরে এটা আবার কোনো রাত হলো? অবশ্য গ্রামের কথা আলাদা। গ্রামের রাত ৮টা বাজার সাথে সাথে খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। ১০টা বাজলো, সবার এক ঘুম হয়ে যায়। শহরে তা নয়। শহরে সবাই রাত জাগে। ফেসবুক, টুইটার, বার, আরও অনেক কিছুর সাথে সঙ্গ দিতে দিতে তারা ভোর রাতে ঘুমায়। শহরের মানুষ নিশাচর। দিন যেন তাদের কাছে রাত। আর রাত যেন দিন।

.

ঘ্রাণটা কোন ফুলের এবং কোন দিক থেকে আসছে তার সন্ধান করতে হবে। এ-অদ্ভুত অথচ অভাবনীয় স্বাপ্নিক ঘ্রাণ তাকে যেন পাগল করে দিচ্ছে। মুশফিক দরজা খুলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়। ঘ্রাণটা কোন দিক থেকে আসছে, সে বোঝার চেষ্টা করে। শহরের বাড়ি হলেও তাদের বাড়িটি গ্রামের বাড়ির মতো বেশ জায়গা নিয়ে। বাবা বলতেন, শহর হোক আর গ্রাম হোক, বাড়ির চার পাশে জায়গা না থাকলে সেটা বাড়ি নয়, মনে হয় মুরগীর খোপ। আর এজন্য বাবা ১বিঘা জমির উপর এ বাড়িটি করেন। বিল্ডিং করার পর যে জায়গা রয়েছে সেখানে কিছু গাছ লাগিয়েছেন। একটি পুকুর কেটে ঘাট বাঁধিয়েছেন। গরমের সময় অবশ্য পুকুরে পানি খুব কম থাকে, প্রায় শুকিয়ে যায়। কিন্তু বর্ষার সময় পুকুরটি জলে টইটুম্বর থাকে। তখন তাকে গ্রামের পুকুরের মতেই মনে হয়। পুকুরে মুশফিকের বাবা বিভিন্ন জাতের মাছ ছেড়েছেন। বাজার থেকে তাই তাদের মাছ কিনতে হয় না। মুশফিকের মনে হলো পুকুর ঘাটের দিক থেকে ঘ্রাণটা আসছে। সে ধীরে ধীরে পুকুর ঘাটের দিকে এগোতে থাকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে এটা তো ছাতিম ফুলের ঘ্রাণ। ছোট বেলায় মুশফিকরা যখন গ্রামের বাড়িতে থাকতো, তখন বাড়ির উঠানের দক্ষিণ কোণায় একটি ছাতিম গাছ ছিলো। যখন তার ফুল ফুটতো, সে কী ঘ্রাণ। একদিন সে মাকে জিজ্ঞেস করে- মা, এ ঘ্রাণ কীসের? মা ঘরের দাওয়ায়

বসে আঙুল তুলে বলে –ওই যে গাছটি দেখছিস, ওটার নাম ছাতিম গাছ। আর এ ঘ্রাণ ওই গাছের ফুলের অর্থাৎ ছাতিম ফুলের। এ কথা বলে মা সতর্ক করে দিলেন- খবরদার ফুল ফুটলে ও-গাছের কাছে যাবি না। কারণ, ফুলের গন্ধে গাছে জ্বিন পরীরা আসে। ওখানে সারা রাত নাচ গান করে। ওখানে কেউ গেলে তাকে পরীরা ধরে নিয়ে যায় কোহেকাফ শহরে। সেখান থেকে কেউ আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারে না। তুই কোনো সময় ও-গাছের কাছে যাবি না কিন্তু। মুশফিক মাকে নিশ্চিন্ত করতে বলে- 'আচ্ছা'। মুশফিক জিজ্ঞেস করে, 'মা কোহেকাফ শহর কোথায়? সেখানে কারা থাকে? 'কোহেকাফ শহর সাতসমুদ্র তের নদীর ওপারে। ওখানে জ্বিন আর পরীরা থাকে। কোহেকাফ শহর হলো জ্বিন রাজ্যের রাজধানী,' মা বলেন। মুশফিক আবার প্রশ্ন করে, 'কোহেকাফ শহর তো অনেক দূর, তাই না?' 'হ্যাঁ',মা বলেন। 'তাহলে অত দূর থেকে জ্বিন পরীরা আমাদের বাড়িতে আসবে কী করে?' মায়ের মুখে হাসি, 'জ্বিন পরীরা আগুনের তৈরী। তাদের পাখা আছে। তারা বাতাসের বেগে উড়তে পারে'। 'ও, তাহলে ঠিক আছে', বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে মুশফিক।

ছোট বেলা মায়ের এ কথা বিশ্বাস হলেও এখন তা আর হয় না। এখন তার মনে হয় রাতে ছাতিম ফুলের ঘ্রানের টানে যাতে মুশফিক ঘর থেকে না বের হয় সেজন্যই মা তাকে এ কথা বলেছিলেন। মুশফিক ধীরে ধীরে পুকুর ঘাটে যায়। সান বাধাঁনো ঘাটের পাশে একটি ছাতিম গাছ। বেশ ফুল ফুলেছে। এখানে গাছটি হলো কবে? কই সে আগে তো দেখেনি? আবার ভাবে, সে দেখবে কী করে। পিএইচডি করার জন্য সে পাঁচ বছর বিদেশে ছিল। এ সময় গাছটি হয়েছে। ছাতিম ফুলের ঘ্রাণ তাকে মাতাল ঢেউয়ের মতো যেন দোলাচ্ছে। যেন এক অপার্থিব পরিবেশ। বর্ষাকাল। পুকুরের পাড় ছুঁই ছুঁই জল। পুকুরকে তার মনে হচ্ছে একটি ভরা কলসি । কোনো রূপসি রমনী এইমাত্র যেন কলসিটি ভরে স্নানে নেমেছে জলে। হঠাৎ করে মিতাকে তার মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে এখন যদি মিতা তার পাশে থাকতো। দুজনে কথায় কথায় হারিয়ে যেতো স্বপ্নের রাজ্যে। কিন্তু মিতাদের বাড়ি তো অনেক দূর। শহরতলীতে। হঠাৎ তার মনে হলো এ মুহূর্তে সে মিতাকে কাছে না পাক কিন্তু একটা ফোন করে তো কথা বলতে পারে। যদিও বিদেশে থাকার সময় রুটিন করে সকালে রাতে প্রতিদিন তার সাথে মুশফিকের কথা হতো। আজ বিদেশ থেকে ফেরার সময় এয়ারপোর্টে বসে মিতাকে ফোন করেছিলো মুশফিক। দীর্ঘ সময় কথা হয় তাদের। এ বাসায় এসেও দু-বার কথা হয়। মুশফিক বলে, 'দেখো মিতা, তোমার তো মাস্টারর্স কমপ্লিট হয়েছে। পিএইচডি কারার ইচ্ছে ছিলো তোমার। আমার শেষ হয়েছে, এবার তোমাকে পাঠাবো। তবে তার আগে আমাদের বিয়েটা শেষ করতে চাই। এবার আর কোনো অজুহাত শুনবো না। ফোনের ওপাশ থেকে হাসির মিহি সুর। রেশমি কাপড়ের মতো। এ সুর মুশফিকের অনেক দিনের চেনা।

হঠাৎ মুশফিকের ফোন বেজে ওঠে। ফোনের ওপাশ থেকে যেনো বেজে উঠলো হারমোনিয়ামের সুর, 'হ্যালো। কেমন আছে মুশফিক?' 'হ্যা ভালো, তুমি কেমন আছো?' 'ভালো আছি। আমার কথা তোমার এখন খুব মনে পড়ছে, আর আমারও, তাই তোমাকে ফোন করলাম'।

মুশফিক অবাক হয়ে যায়। যখনই মিতার কথা ওর মনে হয়, তখনই ওর ফোন বেজে ওঠে। মিতা ফোন করে ওকে। মুশফিক যে পাঁচ বছর বিদেশে ছিলো প্রতিদিন একই ঘটনা ঘটেছে। প্রথম প্রথম টেলিপ্যাথি মনে করে মুশফিক বিষয়টি নিয়ে ভাবেনি। কিন্তু বছরের পর বছর যখন এ ঘটনা ঘটছে তখন একদিন সে মিতাকে জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি করে বলোতো মিতা, তুমি কি করে টের পাও যে তোমার কথা আমার মনে পড়ছে?' মিতা হাসে। সেই চিরচেনা হাসি। তাকে না দেখে যে হাসি শুনেই তাকে মুশফিক ভালো বেসেছিলো।

সেদিনের ঘটনা এখনও চোখের সামনে ভাসছে মুশফিকের। থার্ডইয়ারের পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরু হতে আরও আধা ঘন্টা বাকি। ছেলেমেয়েরা সব জড়ো হয়েছে। হলের একপাশ থেকে একটি মেয়েলি কণ্ঠের হাসির আওয়াজ আসছে। মুশফিকের ওই হলে পরিদর্শকের দায়িত্ব ছিলো। সে হলের দিকে যাবার সময় হাসির শব্দ শুনেত পায়। এমন হাসি সে কোনো দিন শোনোনি। কৌতুহল বশতঃ সে মেয়েটিকে দেখার জন্য হলের পাশে যায়। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি বলে, 'সরি স্যার'। 'সরি কেন?' কী বলবে ভেবে পায় না মিতা, 'স্যার হলে যাই'। 'ওকে, যাও' মিতা তার বান্ধবীকে নিয়ে হলের দিকে যায়। মুশফিক বলে, 'তোমার নাম কি? 'স্যার, মিতা। সোনিয়া আক্তার মিতা। এপর থেকে তারা দুজন ধীরে ধীরে কাছাকাছি চলে আসে। মুশফিক বলে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি মিতা'। মিতা কিছু বলে না একটু হাসে। 'কিছু বললে না?' মুশফিক বলে। 'বলিনি বুঝি? আমি বলিছি তো ? আপিনি শোনেননি'। আবারও হাসে। 'কখন বলেলে?' 'যখন হাসলাম। মেয়েদের হাসিও যে তার বুকের ভাষা। তা পড়তে পারেন না স্যার?' মুশফিক বোকা মনে যায়। প্রেমে পড়লে মানুষ নাকি বোকা হয়ে যায়, সে যত জ্ঞানী হোক না কেনো। এ কথা এত দিন জানতো সে, আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

'তুমি আমার মনের কথা কীভাবে টের পাও মিতা?', মুশফিক বলে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই'। আবার হেসে ওঠে মিতা। মুশফিকের মনে হয় সে হাসি যেন মোবাইল ফোন ছাড়িয়ে ছাতিম ফুলের গন্ধের মতো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বাতাসে ঢেউ হয়ে ভাসছে সে হাসি। 'তুমি তো আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসো, না। যদি তুমি আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসতে তাহলে আমার মনের কথা বুঝতে পারতে। আমি তোমাকে ভালোবাসি বলে তোমার মনের কথা বুঝতে পারি। দূরে বা কাছে যেখানে থাকো না কেন। মুশফিক অবাক হয়ে বলে, 'তাই? আমি তোমাকে গভীরভাবে ভালোবাসি না?' 'না বাসো না। বাসলে তো বুঝতে পারতে'। মুশফিক মজা করে বলে, 'তুমি কি অশরীরী, যে আমার সব কিছু জানো'। ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে আসে সেই অপূর্ব হাসি। মিতা বলে-হ্যা, 'আমি তো অশরীরী, তুমি জানো না?' আবার হেসে ওঠে। মুশফিকের ভেতর কেমন যেন কিউরিওসিটি বেড়ে যায়। সে মিতাকে বলে, 'আচ্ছা বলো তো আমি এখন কোথায় আছি?' 'তুমি তোমাদের পুকুর ঘাটে'। মুশফিক অবাক হয়ে যায়। মিতা বলে, 'তোমার পিছনে একটি ছাতিম গাছ আছে। আমি ছাতিম ফুলের ঘ্রাণ টের পাচ্ছি। মুশফিক বলে, 'সত্যি করে বলোতো তুমি কোথায়? মিতা বলে, 'তোমার কাছে'। 'মানে, কোথায় তুমি?', মুশফিক বলে। 'বললাম না আমি তোমার

কাছে আছি। তোমার পিছনে তাকিয়ে দ্যাখো।' মুশফিক অবাক হয়ে যায় মিতার কথায়। বলে কি? মিতা এখানে? তা কি করে সম্ভব! সে পিছনে তাকায়, দেখে ছাতিম গাছের একটি ডাল ধরে মিতা দাঁড়িয়ে। 'মিতা, তুমি এত রাতে এখানে এলে কী করে?' 'আমি কীভাবে এলাম, সেটা জেনে তোমার দরকার নেই। তবে একটি কথা মনে রেখো, আমার কাছে কোনো অসম্ভব বলে কিছু নেই'। আমি তোমার জন্য সব করতে পারি'। মুশফিক যেন ভাষা হারিয়ে ফেলছিলো। মিতা কীভাবে এখানে এলো, সে চিন্তা যেন তার মাথা থেকে সরে গেলা। মিতা তার পাশে এসে বসলো। 'তুমি এত দেরী করে এলে কেন মুশফিক?' মিতা মুশফিককে জড়িয়ে ধরে। টেনে নেয় বুকের ভিতর। মুশফিকও তাকে জড়িয়ে ধরে। সারা রাত কথা হয় ওদের। এক সময় মিতা বলে, 'মুশফিক আর আমি থাকতে পারবোনা। এখনই আমাকে যেতে হবে। মুশফিক যেন ঘোরের মধ্যে বলে, 'না তুমি যেওনা মিতা। আরেকটু থাকো। প্লিজ।' 'তুমি বুঝতে পারছো না কেন মুশফিক। আমার পক্ষে এখন আর থাকা সম্ভব নয়। মুশফিকের কপালে একটি চুমো দিয়ে দ্রুত হেটে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায় মিতা। এসময় মসজিদ থেকে ভোরের আযান ভেসে আসে। ভোরের আযান শোনার পর মুশফিক যেন সম্বিত ফিরে পায়।

মুশফিক ঘরে ফিরে এসে সোফায় শরীর এলিয়ে দেয়। এবার তার মনে এই প্রশ্নটি আবারও ফিরে আসে এত রাতে মিতা এখানে কি করে এলো? ও কি মিতাই ছিলো, না অন্য কেউ। প্রশ্নটি তার মাথায় ঘুরতেই থাকে, কিন্তু কোনোও সামাধান পায় না। তার গা কেমন শিউরে ওঠে।

বিদেশে যাওয়ার সময় বিমান বন্দরে মুশফিকের মোবাইলটি হঠাৎ হারিয়ে যায়। তাকে একটি নতুন মোবাইল কিনতে হয়। ফলে তার বন্ধুদের কোনো নম্বরই তার কাছে ছিলনা। মিতার নম্বরটি মুখস্ত থাকার কারণে ওই একটি নম্বরই ছিল। যার কারণে বন্ধুদের সাথে তার আর যোগযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এখন পুরোনো ডায়রি খুঁজে সে সেজানের নাম্বরটি পায়। সেজান ওর বন্ধু এবং মিতাদের এলাকায় বাড়ি। ও মিতাকে চিনতো। মুশফিক সেজান কে ফোন করে। সেজান ঘুম জাড়ানো কণ্ঠে বলে- 'কে?'

- 'আমি মুশফিক।'
- 'মুশফিক তুই কোথায়।?'
- 'আরে, আমি তো দেশে এসেছি গতকাল। এখন বাড়িতে।'
- 'তুই বিদেশে গিয়ে আমার সাথে যোগযোগ বন্ধ করে দিলি কেন?'
- 'আমার মোবাইলটি হারিয়ে গিয়েছিল। ফলে তোদের নম্বরও। এ জন্য তোর সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। ফেসবুকেও চেষ্টা করেছি, কিন্তু তোর আইডি খুঁজে পাইনি।'
- 'আমার কোনো আইডি নেই তো, খুঁজে পাবি কী?'
- 'কেন?'
- 'একটি সমস্যার কারণে আইডি বন্ধ করে দিয়েছি',

- 'সেজান তুই একটু মিতাদের বাড়িতে যেতে পারবি?

- 'মিতা?'- সেজান যেনো আকাশ থেকে পড়ে।

- 'কেন কি হয়েছে?', মুশফিক বলে।

- 'তুই বিদেশে যাবার একমাস পর মিতা তো সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে।'

- 'কী বলছিস?'

মুশফিকের হাত থেকে মোবাইল ফোনটি নিচে পড়ে যায়। মুশফিকের যখন জ্ঞান ফেরে তখন রাত। দেখে সে হাসপাতালে। হঠাৎ তার ফোন বেজে ওঠে। মুশফিক তাকিয়ে দেখে স্ক্রিনে মিতার নাম ভেসে উঠছে। মিতা ইজ কলিং।

অ ণু গ ল্প

বুকের দুধ

কৃপাণ মৈত্র

ত্র্যম্বক যখন দুবাই যায় তখন তার স্ত্রী সাত মাসের। এখন ছেলের বয়স এক বছর। ভালো করে চলতে বা কথা বলতে পারে না। ত্রম্বকের সঙ্গে ছেলের পরিচয় মাত্র একদিনের। ত্রম্বক ছেলেকে পার্কে নিয়ে যাওয়ার জেদ করল।

মুর্মু বলল, আমি যেতে পারব না। মায়ের ডাক্তরের কাছে এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তুমি একা পারবে না।

- বৌমা, আমি না হয় একা...

-না না, সে হয় না।

- তুমি ছেলের বাপের উপর ভরসা রাখতে পারছো না।

মুর্মু বাবুকে একটা লাল রঙের বাবাসুট পরিয়ে বলল,দেখো বাচ্চা বয়সে প্রায় সব বাচ্চা এক রকম দেখতে। লাল রঙের বাবাস্যুটটা সব সময় নজরে রাখবে।

পার্কে শিশুদের মেলা। প্রায় সবার পরনে লাল রঙের বাবা স্যুট। একটা বল গড়িয়ে গড়িয়ে বাবুর কাছে এল। সে বল ঠেলতে ঠেলতে শিশুদের ভিড়ে মিশে গেল। ত্রম্বক খুব খুশি। সে ব্যাগ থেকে চকোলেট বের করে বাচ্চাদেরকে বিলিয়ে দিয়ে অনাবিল আনন্দ পেল।

এক ঘন্টা পর মুর্মুর ফোন। চলে এসো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ত্রম্বক ব্যস্ত হয়ে বাবুকে কোলে নিয়ে মোটর বাইকে করে বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরতে চিৎকার-চেঁচামেচি কান্নার রোল পড়ে গেল।

- এ তুমি কার বাচ্চা এনেছো। বাবু কোথায়!

- কেন এইতো লাল রঙের বাবাস্যুট...

- বৌমা, ত্রম্বককে নিয়ে এক্ষুনি পার্কে যাও। এখনো হয়তো বাচ্চার মা তার বাচ্চার অপেক্ষায় বাবুকে নিয়ে অপেক্ষা করছে।

পার্কের গেট বন্ধ। মুর্মু কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এল। বাচ্চাটা কেঁদে পাড়া মাথায় করছে।

বৌমা, তোমার বুকটা ধরিয়ে দাও না মা। নিশ্চয় ওর মাও বাবুর মুখে অমৃত ধরেছে।

বাচ্চাটা গরম কোলে অমৃত পান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন ত্রম্বক এবং মুর্মু দেখল এক বোরখাপরা মহিলা বাবুকে কোলে নিয়ে পার্কের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবুকে মুর্মুর কোলে তুলে দিয়ে নিজের ছেলেটিকে কোলে নিয়ে মহিলাটি বলল, একটা বড় গুনাহ হয়ে গেছে। কান্না সইতে পারছিলাম না। বুকের দুধ ধরিয়ে দিতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো। মুর্মু চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকালো।

সারপ্রাইজ

গৌতমী ভট্টাচার্য

"হ্যালো সাগর। ম্যাচটা আজ ভাল করে খেলতে হবে। তোর ওপর খুব ভরসা করে আছি রে। ম্যাচটা জেতাতেই হবে তোকে।"

-"চিন্তা করিস না ইয়ার। চেষ্টা তো করতেই হবে।"

ফোনে যখন কথা হচ্ছিল তখন সকাল সাতটা। ইন্দ্রনীল সাগরের ব্যাচমেট। একটু উত্তেজিত দুজনেই। আজ ক্রিকেট ম্যাচ সেমি ফাইনাল -- দুটো স্কুলের এক্স- স্টুডেন্টদের মধ্যে। টানটান উত্তেজনা সকলের।

আজ দিনটিও সাগরের পরিবারের কাছে বিশেষ দিন। মা একটু বেশিরকম বাড়াবাড়ি করেন প্রতিবছর। একমাত্র ছেলের জন্মদিন। সাগর এখন বড় হয়েছে। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর ওর কাছে। তাই আত্মীয়-পরিজন নেমন্তন্ন বন্ধ করে দিয়েছে নিজেই।

-“নতুন জার্সিটা খাটে রাখা আছে। স্নান করে পড়ে নে সাগর। আমি পায়েস রেঁধেছি। সাথে লুচি ভেজে দিচ্ছি। খেয়ে যাবি।" ও ঘর থেকে মা চেল্লাচ্ছে।

মায়ের এটুকু আবদার সাগরকে মেনে নিতেই হয়। প্রদীপ, ধান-দুর্ব্বো, পায়েস সাজিয়ে জন্মদিনের আশীর্বাদ করলেন বাবা-মা।

-"আজ সন্ধেবেলা তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দেব।"

-"কি সারপ্রাইজ বাবা? তুই জিতে আয় এটাই বড় সারপ্রাইজ।" মায়ের আবেগ উছলে পড়ে।

প্রণাম করে বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ব্যাট হাতে সাগর খেলতে বেরিয়ে গেল। বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধে। বাড়িতে খবর এল শেষ বলে ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতিয়ে দিয়েছে সাগর। কিন্তু আগের বলটি সাগরের তলপেটে ভয়ঙ্কর আঘাত করে বেরিয়ে যায়। অসম্ভব সহ্যশক্তি নিয়ে ম্যাচ খেলেছে সাগর। শেষে অজ্ঞান অবস্থায় ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আকাশ ভেঙে পড়ল সাগরের বাবা-মায়ের মাথায় সন্তানহারা হবার আশঙ্কায়।

ম্যাচ জিতেছে সাগর। কিন্তু জ্ঞান আর ফেরে নি।

-"সারপ্রাইজ এত মর্মান্তিক হয়?"

বাবা-মায়ের এ প্রশ্নের জবাব কারো জানা থাকলে বলবেন।

সাত

উৎপলেন্দু পাল

"সাত খেলাইছে, সাত", চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো জাকির।

ভাগা পানের দোকানি জাকিরের লটারি লেগেছে। ওয়ান ডিজিট লটারি। আজ পাক্কা নয় হাজার ঢুকবে পকেটে।

'সাত' ওর প্রিয় নম্বর। প্রতিদিনই একগাদা 'সাত' কাটে ও। কখনো সখনো পায়নি যে তা নয়, এবার বড় দান লেগেছে।

পাশের লটারিওয়ালা মনোজ বলে, "মাল খাওয়ার পাইসা ছাড়। “সুর মেলায় সাইকেল মেকার নরেশ ও চা দোকানি অতুল।

"খাওয়ামু, খাওয়ামু, আজি কায় কত খাবার পাইস, "আনন্দে গদগদ জাকির।

রাত আটটায় টাকা হাতে এলো। অতুলের দোকানের ফাঁকা বেঞ্চে বাংলা মদের ঢালাঢালি। রঙিন আবেশ , তারপর রাত বাড়তেই বাড়ির পথে।

পথটা শুনশান। পা টলছে। ডাইনে বাঁয়ে কিছুই দেখছেনা সে। যেতে যেতে জাকির ভাবছে, কাল দুপুরে বাজারে গিয়ে বউ বাচ্চার জন্য নতুন জামা কাপড় কিনবে। ওই সময়টা বেচাকেনা কম থাকে। বউটা পাঁচটা বাড়িতে মাসির কাজ করে। বলতে গেলে সংসারটা ওই টানে। জাকিরের যা আয় তা বন্ধনের কিস্তি, এন্ডিং লটারি আর মাল খেতেই শেষ। ওই ঈদ ছাড়া সারা বছর আর জামাকাপড় কেনা হয়না। বাবুদের বাড়ির পুরোনো জামা কাপড়েই বাচ্চা দুটোর বছর কাটে। যাক এবার নতুন কিনে দেবে।

মাল খেয়ে, লটারিওয়ালাকে বখশিস দিয়ে এখনো পকেটে সাড়ে আট আছে। আর কি কি করা যায়? কাল আধা কেজি খাসির মাংস কিনতে হবে, ' আমিনা মাংসটা রাঁধে খাসা । আহ্, বাচ্চাগুলো কবে থেকে খাসির মাংস খায়না। “মাংস বলতে তো সেই পোলট্রির মাংস, আর পাঁঠার নাড়িভুড়ি”।

চালা ঘরটার টিন ফুটো হয়ে গেছে। গত বর্ষায় একেবারেই ঘুমোতে পারেনি রাতে। এবার ঠিক হয়ে যাবে। আমিনার মোবাইলটা খারাপ হয়ে গেছে, একটা মোবাইলও কিনতে হবে। না এবার সেকেন্ড হ্যান্ড নয়, নতুন। আর টিকিট কাটার জন্যও ...

এক সময় জাকিরের পানের দোকান ছিল রমরমা। লোকে বলে এই এন্ডিং লটারিতেই সব খেয়েছে। আমিনাও তাই বিশ্বাস করে । এখন পুঁজিপাট্টা গায়েব, শুধু ভাগা পান আর খৈনি।

' দেখা যাক, এবার দোকানটা সাজাতে হবে। আল্লা যখন দিছে!” কৃতজ্ঞতাবশে আল্লাকে ধন্যবাদ জানায় মনে মনে ।

বাড়ির সামনের চৌপথিটা পেরোনোর সময় হঠাৎ একটা বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়লো সে। মাথাটা লাগলো ল্যাম্প পোস্টে। মগজের ভেতর অসংখ্য 'সাত' লাফালাফি করতে লাগলো। বাইকওয়ালা ছিটকে পড়েছে ড্রেনে। ধীরে ধীরে সব 'সাত' মিলিয়ে গেল, তারপর সব চুপ ।

দু-একজন দৌড়ে এলো। 'আরে এ তো জাকির!'

শরীরটা নড়ছেনা, সব যেন থেমে গেছে। 'শ্বাস পড়ছে না, বুকে ধুকপুকানিও নেই'। সবাই বলাবলি করছে।' ‘এই হাসপাতালে নিয়ে চল, বাড়িতে খবর দে’।

জাকিরের পৃথিবীটা থেমে গেছে। পকেটে এখনো সাড়ে আট হাজার। স্বপ্নেরাও ওই টাকার ভাঁজে শুয়ে আছে চুপচাপ!

‘শাদ্বল’ ই-পত্রিকায় লেখা দেওয়ার ঠিকানা ও নিয়মঃ. ১. যে কোনো ছোটো দৈর্ঘ্যের লেখা লেখককে প্রথমে এম. এস. ওয়ার্ডে লিখতে হবে। তারপর তা ডক্স ফাইল হিসাবে পাঠাতে হবে। পি. ডি. এফ হিসাবে নয়। বিকল্প হিসাবে নোট প্যাডে লিখে কপি পেস্ট করে পাঠাতে পারেন। এতে অবশ্য লাইন ফরম্যাট ভেঙ্গে যেতে পারে। জি-মেল বডি বা ওয়াটসয়্যাপ বডিতে লিখে পাঠানো যাবে। সব থেকে ভালো এম.এস.ওয়ার্ড ডক্স ফাইল। 2. পাঠাবেন এই জি-মেল বা ওয়াটসয়্যাপ নম্বরেঃ (ক) শাদ্বল হোয়াটসঅ্যাপ নংঃ ৯৫৬৪৬৩২৪০৭ (খ) শাদ্বল ই-মেলঃ shadwalpatrika@yahoo.com

জীব দেবেন যিনি আহার দেবেনই তিনি

হরিদাস পাল

শুভমিতা বেশি সন্তানের মা হয়ে সংসার কখনোই ভারি করতে চায়নি। খুব বেশি হলে দু-খানা, ছেলেই হোক্ আর মেয়েই হোক্। ছেলের পর মেয়েই হলো। তবু সুবর্ণ কথা শুনলো না। দেড় বছর বাদে বাদে আরও তিনখানা পুত্র সন্তান।

ছেলেমেয়েরা তখন স্কুলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সব দিক ঠিক সামলিয়ে উঠতে পারছে না শুভমিতা। রাগত গলায় সুবর্ণকে বললো, " পাঁচ সন্তানের মা হওয়া কি চারটি খানি কথা? তুমি কী বললে? জীব দেবেন যিনি, আহার দেবেনই তিনি। এখন তোমার সেই " তিনি " কোথায় গেলেন? ওরা তো বিনা আমন্ত্রণে আসে নি, কষ্ট করবে কেনো। "

সুবর্ণ নিজের ভুল স্বীকারে বললো, " কী আর করা যাবে, ওদের তো মেরে ফেলতে পারবো না। সংসার যে এতোটা টানাপোড়েনে পড়বে ভাবিনি কখনও। শুনেছি এর মধ্যেই কারখানা খুলবে। ধারদেনা বাকিতে আর ক 'টা দিন চালিয়ে দাও, তারপর সব শুধরিয়ে দেবো। "

শুভমিতা-- আর কতো! এখন মধুদার দোকানে গেলে নিজেরই খারাপ লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার সুশ্রী বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারেন না। এরপর হয়তো ওনার চোখে বিশ্রী-ই লাগবে। এই ধারদেনা বাকি থেকে আমাকে রেহাই দাও। কাজটা তুমিই নাও না? (মা মা, খেতে দাও, স্কুলের সময় হয়ে গেলো) ওই যে বড় ছেলের গলা। দাঁড়াও ওদের খাওয়ার পাট শেষ করে আসি। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে, এর মধ্যে যাবে কীভাবে? ছাতা তো দুটো।

সুবর্ণ-- বলে দাও আজ স্কুলে যেতে হবে না।... তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ হতে দেখে বিস্মিত গলায় বললো এতো তাড়াতাড়ি যে?

শুভমিতা চোখ নামিয়ে শোনালো, " দু-জনের ভাত পাঁচজনে খেতে কতক্ষণ?"

সুবর্ণ ছলছল চোখে অস্ফুটে বললো, "ঠিকই বলেছো। আমারি বুঝতে ভুল হয়েছে। কী যেনো বলছিলে? ও ধারদেনা। না না, ওসব ঝামেলায় আমাকে টেনো না। যাও একটু নির্ভেজাল হয়ে আছি, ওদিকে হাত বাড়ালে ধরে রাখতে পারবো না। "

শুভমিতা চেতে গেলো, " কেনো, বউরাই সংসারের সব কিছুতে দায়বদ্ধ নাকি? মশারি টাঙানো, বিছানা করে গুটিয়ে রাখা, ঘর ঝাড়া, মাছ-সব্জি কাটা, থালাবাসন ধোয়া সবই কি হাউজ ওয়াইফের দায়বদ্ধতা? সেই কবে থেকে কারখানা বন্ধ, তবুও তো খেয়ে থালাটাও আমার জন্য রেখে দেওয়া। এই বুঝি পুরুষের পুরুষত্বকে টিকিয়ে রাখা? (ভিতর থেকে ছোটো মেয়ে বলে উঠলো, " মা, বৃষ্টি কমেছে, স্কুলে যাবো, দিয়ে যাও। ") এখন একে একে সবাই টিফিন খরচ চেয়ে বসবে। কী করবো, লক্ষ্মীর ভান্ডার যে শূন্য!

সুবর্ণ সোজা পথ বলে দিলো, " যাও দৌড়ে মধুর দোকান থেকে পাঁচখানা কেক এনে ওদের হাতে ধরিয়ে দাও।

শুভমিতা বেশ নম্র সুরেই বললো, " ওরা বড় হয়েছে, এখন কি আর ওই কেক টেক চলে? আজ নয় হলো, কাল?

সুবর্ণ-- কালের চিন্তা কালই করা যাবে। বর্তমান ভাবো, বুঝলে বর্তমান ভাবো।

শুভমিতা-- এটাই তোমার নিরেট ভুল। ভবিষ্যৎ ভাবলে অন্তত এতোটা খারাপ অবস্থায় থাকতাম না।

সুবর্ণ-- দেখবে দেখবে শুভমিতা, এ কষ্ট আর বেশিদিন থাকবে না। আচ্ছা একটু ভেবে দেখো তো, ওরা যখন চাকরি করে কারি কারি টাকা আনবে, তখন কেমন লাগবে? মনটা আনন্দে ভ'রে উঠবে না?

শুভমিতা হাসে, "চাকরি! অনিমেষদার এক ছেলে, রেজাল্টও হাইফাই, আজ পর্যন্ত কোনো হিল্লে হলো না। আর তুমি একজন নয়, দু-জন নয়,পাঁচ পাঁচজনের স্বপ্ন দেখছো? বাস্তব বড় কঠিন, বাস্তব ভাবো, বাস্তবের সাথে চলো।

সুবর্ণ-- সবসময় নেগেটিভ ভাবো কেনো? আরে, স্বপ্নই সবাইকে বাঁচিয়ে রাখে।

শুভমিতা-- রাখো তোমার স্বপ্ন! ভাবছি আগামী দিনগুলো, রাস্তা ঘাটে যা দেখি! ওরা যখন কিশোর কিশোরী বেলায় পৌঁছবে, তখন আরও সাত চিন্তা মাথায় এসে বসবে। দু-একজন হলে তাও নয় চোখে চোখে রাখা যতো। এই পাঁচ পাঁচজনকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলা ভাববারই বিষয়!

সুবর্ণ-- আঃ! পরের ভাবনা চিন্তা আগেই কেনো? বলেছি না, সবসময় বর্তমান নিয়ে চলো। সময় পরিবর্তনশীল। (মোবাইল বেজে উঠলো) দাঁড়াও দাঁড়াও, দেখি কে করেছে। হ্যাঁ দিবা, কারখানার খবর কী? ভালো? কী বলছিস্! আগামী সপ্তাহেই খুলছে? কী দারুণ সুখের খবর দিলি রে! কীভাবে যে চলছিলাম, বলে বোঝাতে পারবো না।... হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, সবার একই অবস্থা! কী শুভমিতা বলেছিলাম না, 'জীব দেবেন যিনি আহার দেবেনই তিনি'।

শুভমিতা-- আহারই কি সব? জীবনের মতো জীবন গড়ে তোলাই সন্তানদের সার্থক জন্ম। তা কি আদৌ পারবে?

সুবর্ণ শুভমিতার দিকে সোজা দৃষ্টি রেখে বললো, 'ঠিকই বলেছো। আগে সেভাবে ভাবিনি, এখন তোমার মতো আমিও ভাবছি'।

'শাদ্বল' ই-পত্রিকায় লেখা দেওয়ার ঠিকানা ও নিয়মঃ. ১. যে কোনো ছোটো দৈর্ঘ্যের লেখা লেখককে প্রথমে এম. এস. ওয়ার্ডে লিখতে হবে। তারপর তা ডক্স ফাইল হিসাবে পাঠাতে হবে। পি. ডি. এফ হিসাবে নয়। বিকল্প হিসাবে নোট প্যাডে লিখে কপি পেস্ট করে পাঠাতে পারেন। এতে অবশ্য লাইন ফরম্যাট ভেঙ্গে যেতে পারে। জি-মেল বডি বা ওয়াটসয়্যাপ বডিতে লিখে পাঠানো যাবে। সব থেকে ভালো এম.এস.ওয়ার্ড ডক্স ফাইল। 2. পাঠাবেন এই জি-মেল বা ওয়াটসয়্যাপ নম্বরেঃ (ক) শাদ্বল হোয়াটসঅ্যাপ নংঃ ৯৫৬৪৬৩২৪০৭ (খ) শাদ্বল ই-মেলঃ shadwalpatrika@yahoo.com

র ম্য র চ না

বয়েস

সুব্রত নন্দী (বর্ধমান)

কথায় আছে মেয়েদের পেটে কোনো কথা থাকে না। কোনো কথা যদি তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে দিতে হয়, তাহলে কোনো মহিলাকে কথাটা কানে দিয়ে বলতে হবে- ‘কাউকে বলবেন না যেন’। ব্যস, তাহলেই কেল্লা ফতে। তবে, একটা জিনিসই ওনারা কেবল গোপন রাখতে পারেন- সেটা হল তাঁদের বয়েস। কেউ কেউ বলেন- সিনেমার নায়িকাদের বয়েস নাকি চার বছর অন্তর এক বছর করে বাড়ে।

রসময় বাবুর আবাসনে নতুন আবাসিক এসেছেন। ভদ্রলোক কে রসময় বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনার চাকুরি জীবন আর কতদিন আছে?’

- চার বছর।

উত্তর শুনে ভদ্রলোকের বয়েসটা বুঝলেও ওনার স্ত্রীর বয়েসটা কিছুতেই ধরতে পারছেন না। রসময় বাবুর বয়েস সবে চল্লিশ হয়েছে। ওনার সমস্যাটা হোলো- নতুন আবাসিক ভদ্রমহিলাকে বৌদি না কাকিমা- কী বলে সম্বোধন করবেন। কোনো কোনো ভদ্রমহিলা আবার 'কাকিমা' ডাক একদমই পছন্দ করেন না। নতুন আবাসিক যুগল একদিন চিন্তান্বিত রসময় বাবুকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করলেন। কথায় কথায় উভয়েরই পরিচিত এক ভদ্রমহিলার প্রসঙ্গ উঠলো। রসময় বাবু বলে ফেলেছেন- আমি তো সুরূপা দেবীকে খুব ভাল করে চিনি। ওনার বয়েস ৪২ বছর, আগে এখানে থাকতেন। সঙ্গে সঙ্গে নতুন আবাসিক ভদ্রমহিলা ফোঁস করে উঠলেন, " কী ? সুরূপার বয়েস ৪২ বছর? জানেন, ও আমার সঙ্গে স্কুলে, কলেজে পড়েছে, আমার বয়েস এখন ৫২, আর ওর ৪২?"

রসময় বাবু একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হলেন- মহিলারা আর যাই হোক, নিজের বয়েস লুকোলেও চেনা পরিচিত কোনো মহিলার বয়েস লুকোতে দেবেন না, আর মহিলাদের বয়েস জানার সহজ উপায় হল, তার সঙ্গে স্কুল কলেজে পড়তো- এমন কোন মেয়ের বয়েস তাকে বললেই ফোঁস করে বলে উঠবে, "ও তো আমার সঙ্গে পড়তো, আমার বয়েস এখন…" , আসল বয়েসটা রাগের মাথায় ফুড়ুৎ করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

শারদ শুভেচ্ছা

। আবার দেখা হবে।

আপনাদের শুভেচ্ছা শাদ্বলের

চলার পথের পাথেয় হোক

SHADWAL PATRIKA

EDITOR: NRIPENDRA NARAYAN BHATTACHARYA

COVER DESIGNING: SANTOSH SINHA

SHIBJAGNA ROAD

KHAGRABARI

COOCHBEHAR

সমাপ্ত